গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

FOAB সংকলন-২০২২

(দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরণ)

জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও FOAB সম্মাননা '২২

২২ জানুয়ারী, ২০২২

ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (FOAB)

ফিস ফিড সমূহঃ

- হ্যাচারী ফিড
- নার্সারী ফিড
- তেলাপিয়া
- পাঙ্গাস
- কার্প
- পাবদা গুলশা
- কৈ, শিং, মাগুর

চিংড়ি ফিড সমূহঃ

- চিংড়ি গোল্ড প্লাস ফিড
- চিংড়ি স্পেশাল ফিড
- সুন্দরী প্লাস ফিড

QUALITY FEEDS LIMITED
Since 1995
COMMITTED TO EXCELLENCE

Corporate Office: House 14, Road 7, Sector 4,
Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

qfl.com.bd /qualityfeedslimited.bd

QFL **Quality Feeds Limited**

FOAB সংকলন-২০২২

(দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরণ)

জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও FOAB সম্মাননা-২২

ফিস ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ও মৎস্য অধিদপ্তর ও ফিসারীজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
২২ জানুয়ারী, ২০২২

সম্পাদনা পরিষদঃ

সম্পাদকঃ

সৈয়দ ইসতিয়াক, মস্যবিদ, সিফুড হ্যাচাপ ও গ্যাপ বিশেষজ্ঞ

সহযোগী সম্পাদকঃ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ একোয়া প্রডাক্টস কোম্পানীজ এসোসিয়েশনস (বাপকা)
মনিষ কুমাড় মণ্ডল, ডিপিডি, কোস্টাল
সুজিত কুমার চ্যাটার্জি, জেলা মস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর
মিজানুর রহমান, সিনিয়র এসিটেন্ট ডাইরেক্টর, মৎস্য অধিদপ্তর
গৌরপদ বাছার, সিনিয়র সহসভাপতি, ফোয়াব
সরজ কুমার মিস্ত্রী, ডিপিডি, কোস্টাল
বুদ্ধদেব হালদার জুয়েল, সদস্য, ফোয়াব
বি এম মনিরুল ইসলাম, এম ডি, ব্রাদার সি ফুড
মোঃ ইউসুফ আলী, হেড অফ অপারেশন, ঢাকা এরেটর
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ একোয়া প্রডাক্টস কোম্পানীজ এসোসিয়েশনস (বাপকা)

জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও FOAB সম্মাননা '২২ বাস্তবায়ন কমিটিঃ

আহবায়ক ঃ মোল্লা সামছুর রহমান (শাহীন)
সদস্য সচিবঃ মোঃ হাবিবুর রহমান রুবেল, সাধারণ সম্পাদক ফোয়াব
অর্থ সম্পাদকঃ সাফায়েৎ হোসেন শাওন, অর্থ সম্পাদক, ফোয়াব
যোগাযোগঃ এ বি সিদ্দিক, আহ্বায়ক, ফোয়াব ঢাকা আঞ্চলিক কমিটি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ঢাকা এয়ারেটর

সদস্য, বাস্তবায়ন কমিটিঃ

মোহাম্মদ আলম, উপদেষ্টা, ফোয়াব
বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন আনু, সদস্য, সরকার মনোনীত বাংলাদেশ জাতীয় মৎসজীবী সমবায় সমিতি লিঃ
জয়দেব বর্মণ, সভাপতি, মেঘনা কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, বায়পুরা, নরসিংদী
শেখ শাকিল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক, ফোয়াব
মোঃ আওলাদ হোসেন খান, আহ্বায়ক, নীফ এসোসিয়েশন, ঢাকা বিভাগ
প্রিন্সিপাল মোঃ তফাজ্জল হোসেন (অবঃ), আহ্বায়ক, রংপুরি অঞ্চল, ফোয়াব
শ্রী রামচন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক, আব্দুলাহপুর মৎস্য ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন

প্রকাশ কাল: ২২ জানুয়ারী, ২০২২

ISBN: ৯৭৮ ৯৮৪ ৯৭৪৩৬ ৭ ১

একটি ফোয়াব প্রকাশনা

ফিস ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)
৫৩, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, মডার্ণ ম্যানশন (লিফটের ১০)
মোবাইলঃ ০১৭১১-৪৮৩৪৫২, ০১৭১২-৪৯৫৮৬৫
ইমেইলঃ foabbd@gmail.com; ওয়েবসাইটঃ www.foabbd.org

প্রচ্ছদঃ আসিফ ইকবাল রাফিদ

সার্বিক প্রকাশ ব্যবস্থাপনায়ঃ
বহুমাত্রিক প্রকাশনা
প্রোপ্রাইটরঃ সৈয়দ অনির্বাণ
২৬ই, রোডঃ ৩বি, মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭,
বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭৩৩৯৮৭৫৯৫, ইমেইলঃ bohumatrikp@gmail.com

সম্পাদকীয়

মাছে মস্তিষ্ক বাড়ে
দুধে বাড়ে বল...

শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রতিটি মানুষের শরীর গঠণ ও পুর্ণগঠনে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে একমাত্র নিরাপদ এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য খাদ্য হলো মাছ এবং মৎস্যজাত পণ্য । বিশ্বের প্রতিটি দেশের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেনীর বেশিরভাগ মানুষের প্রিয় খাদ্যের তালিকায় মাছের অবস্থান সর্বাগ্রে । মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী এই পণ্যটি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ অবস্থানে আছে । এই উৎপাদিত মৎস্যের সবগুলো কি মানুষের খাওয়ার জন্য নিরাপদ??? এর উত্তর পাঠক আপনারা ভালো জানেন । নিরাপদ এবং গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের অবস্থান হীমায়িত চিংড়ি রপ্তানীর মতো অনেক নীচে নেমে যাবে । উৎপাদিত মৎস্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করতে না পারলে এই খাত কখনোই টেকসই হবে না । রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হলে মাছের উৎপাদন খরচ কমাতে হবে এবং গুণগতমানসম্পন্ন নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে । বর্তমানে মৎস্যখাতকে রপ্তানীমুখি করার পথে অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে । এই সকল বাধা বিপত্তি উত্তোরণের উপায়সমুহ নীতিনির্ধারনী মহলে তুলে ধরা এবং তা বাস্তবায়নে সহায়কের ভুমিকা পালন করতে ঝঙঅই এর জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও FOAB সম্মাননা '২২-এর আয়োজন এবং 'FOAB সংকলন-'২২' প্রকাশনার উদ্দোগ ।

সংকলনটির প্রবন্ধাদী চাষী বান্ধব করে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে । সংকলনে আধুনীক এবং নীবির পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি/কাঁকড়া চাষ বিষয়, পরিবেশবান্ধব ব্যাবস্থা, মৎস্য সাংবাদিকতা, মৎস্য পণ্য মুল্য সংযোজন, রপ্তানী বৃদ্ধিতে করনীয়, আধুনিক ও যুগপোযোগি মৎস্য চাষের উপকরণ, মৎস্য ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ক লেখা নিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক লেখকই তাদের লেখায় বাস্তবধর্মী এবং চাষীবান্ধব বিষয়গুলো সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে । মুল প্রবন্ধে বাংলাদেশে মাছ ও চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা, সমস্যাসমুহ এবং উত্তোরনের উপায় তুলে ধরা হয়েছে । জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও FOAB সম্মাননা '২২ উপলক্ষ্যে যাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হবে, এই সংকলনে তাদের সফলতার গল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে । এই সফলতার গাঁথা গুলো পড়ে কোন চাষী কিংবা মৎস্য শিল্পের সাথে জড়িত কোন সুফলভোগীর যদি উপকারে আসে তবে এই সংকলন প্রকাশ করা সার্থক হবে । সময়স্বল্পতার কারণে সংকলনের অনেক ভুলক্রুটি সংশোধনের সুযোগ হয় নাই, পাঠকগণ বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ।

সৈয়দ ইসতিয়াক
syedistiak75@gmail.com
সম্পাদক, সংকলন প্রকাশনা কমিটি ।

মোঃ জসিম উদ্দিন
সভাপতি, এফবিসিসিআই

বার্তা

ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ফোয়াব) জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও ফোয়াব সম্মাননা উপলক্ষে ফোয়াব সংকলন-২০২২ (“দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরণ”) স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ আনন্দঘন আয়োজনের জন্য আমি ফোয়াব কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাচ্ছি।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে অভিযাত্রার সাম্প্রতিক স্বীকৃতি অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময় ঘটনা। তবে দেশের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন, ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ও উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে ফিশফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)কে মৎস্য খাতের উন্নয়নে আরো যত্নবান ও সুনির্দিষ্ট দিক নিদের্শনা দিতে হবে।

বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান এখন তৃতীয়। বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে পঞ্চম। ইলিশ উৎপাদনে প্রথম ও তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ। দেশের মৎস্যখাত যেভাবে বিকশিত হয়েছে, এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে ভবিষ্যতে ফিশফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)-এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি আশা করছি। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ আহরণ, পরিবহন, বিপণন বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রান্তিক আহরণকারী ও উৎপাদনকারীদেরকে সার্বিক সহায়তা বাড়াতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ফোয়াব) এর আগামী প্রকাশনায় সরকারের সেই প্রয়াস এবং মৎস্যখাতের সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটবে বলে আমি আশা করি।

আমি এই স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ জসিম উদ্দিন
সভাপতি, এফবিসিসিআই

বাণী

খন্দকার মাহবুবুল হক
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

সুস্থ ও উর্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের বিকল্প নাই। ১৫ টি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ একমাত্র প্রাণিজ আমিষই হচ্ছে মাছ। বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মৎস্য খাত জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য খাতের উন্নয়নে উন্নয়নের শেকড় গ্রাম থেকে নীতিনিধারনী পর্যায়ে গুরুত্বপুণ ভুমিকা পালন করে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তর গত ১৯-২০ অথবছরে ৪৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করে বিশ্বে মৎস্য চাষ থেকে উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। এই সাফল্য সরকারের একার নয়, মৎস্য সেক্টরের সকল সুফলভোগীগণ এবং মৎস্য চাষী সংগঠন সমুহের। আধুনিক বিশ্বের সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রাপ্তি এবং যোগাযোগের সর্বাধুনিক মাধ্যম হলো তথ্যপ্রযুক্তি। মৎস্য সেক্টর ও এর ব্যতিক্রম নয়। সকল সুফলভোগীগণের সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় চাহিদা পুরুন করে রপ্তানীমুখি এবং পরিবেশ বান্ধব মৎস্য শিল্প গড়ে তোলার উপযুক্ত সময় এখন। এ ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে ফিশ ফার্ম ওনারর্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ফোয়াব) জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও ফোয়াব সম্মাননা শিরোনামে একটি মৎস্য কংগ্রেস এবং "ফোয়াব সংকলণ '২২" (দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরন) শিরনামে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই স্মরনিকাটির প্রবন্ধাদি হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাবসাভিত্তিক গুণগতমানসম্পন্ন মাছ ও চিংড়ি চাষ, টেকশই আহরণ ও পরিবহন, উৎপাদিত পন্যে মুল্য সংযোজন, প্রতিকুল পরিবেশে কী কী করা যায় সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।

ফোয়াব সঠিক সময় মৎস্য উদ্দোক্তাদের নিয়ে এই কংগ্রেসের আয়োজন করেছে এবং আমি এর সাফল্য কামনা করছি।

খন্দকার মাহবুবুল হক
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

কো-অর্ডিনেটর, বিপিসি ও
যুগ্ম-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৫ মাঘ ১৪২৮
১৯ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ মৎস্য ও চিংড়ি চাষের জন্য অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এ দেশের জনসম্পদ, মাটি, পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত বাংলাদেশের চিংড়ির গুনগতমান ও স্বাদ অতুলনীয়, যা বিশ্ববাজারেও বেশ সমাদৃত। আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভাবনাময় এ শিল্পখাত আজ খামার পর্যায়ে চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ায় ক্ষতির সম্মূখীন। অপরিপক্ক উপায়ে মৎস্য চাষ ব্যবস্থপনা এবং রোগবালাই দমনে নানাবিধ এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার এ শিল্পকে ক্রমশঃ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, ফিম ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব) থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশের মৎস্যচাষী, মৎস্যব্যবসায়ী ও মৎস্য সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে 'জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও ঋঙঅই সম্মাননা-২০২২' আয়োজন করতে যাচ্ছে । এ উপলক্ষ্যে একটি সম্মাননা স্মরনিকা প্রকাশতি হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এ স্মরনিকায় জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সুপারিশ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ সংকলনের প্রস্তুতিতে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি সংকলনটির সুপারিশসমূহ আমাদের ক্ষুদ্র মৎস্য উৎপাদনকারীদের আরো সংগঠিত হতে সাহায্য করবে এবং নিজেদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে আরো সফলভাবে কাজ করতে সহায়ক হবে। সর্বোপরি আমাদের টেকসই উন্নয়ন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

(মোঃ আবদুর রহিম খান)

বাণী

শেখ সোহেল
প্রধান উপদেষ্টা, ফোয়াব

দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ও স্বনির্ভর করার সাথে সাথে আপামর মানুষের জন্য নিরাপদ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ । এ খাত থকে দেশের জন সাধারনের মৌলিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দেশজ উপাদানের সাথে সাথে গ্রামীন দরিদ্র বিমোচন ও শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন সূযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে । মৎস্য খাত দেশের রপ্তানী বানিজ্য বৃদ্ধিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে । মৎস্য খাত জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রেখে চলছে, সঠিক আহরণ, উৎপাদন ক্ষমতার প্রযুক্তিযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এর অবদান আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব । এদেশের মৎস্য উৎপাদন কর্মীরা নানাবিধ অবহেলা ও সমস্যার কারণে মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন অভিষ্ট মাত্রায় অভিষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি করতে পারছে না । তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসারতা ও আধূনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন বিষয়ক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এ বিষয়ে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে সক্রিয় বলে আমি মনে করি । টেকসই কর্মসংস্থান, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও প্রানীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করতঃ মৎস্য আহরণ, উৎপাদন , যথাযথ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এ সম্পদের উন্নয়নে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভরদক্ষতা বৃদ্ধিতে সকলকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে এগিয়ে আসতে হবে । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরন সময়ের চাহিদা আর তা পূরনে "ফোয়াব সংকলন - ২০২২" জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস ও ফোয়াব সম্মাননা স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে । আমি এই উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

শেখ সোহেল
প্রধান উপদেষ্টা, ফোয়াব

কিছু কথা

মোলা সামছুর রহমান (শাহীন)

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (FOAB)
(সদস্য সরকার মনোনীত) বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

> *"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন"*
>
> **-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান**

মাছ এনেছে দেশের মর্যাদা, সমৃদ্ধ করছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, পুরণ হচ্ছে অপামর জনগণের পুষ্টি চাহিদা এবং বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মসংস্থান। এখাতে মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, বিপনন, প্রক্রিয়াজাতকরন এবং রপ্তানীকে ঘিরে বিভিন্ন ব্যবসা গড়ে উঠেছে। নিরাপদ আহরণ, উৎপাদন, পরিবহন, এবং বাজারজাতকরন পদ্ধতি উন্নত দেশের ন্যায় উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা এবং সি-ফুড হ্যাচাপ মেনে প্রতিপালিত হওয়া সময়ের দাবী। কৃষির পাশাপাশি মৎস্যই একমাত্র টেকসই খাত যা স্থানীয় সম্পদের পরিবেশ বান্ধব এবং যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করে, দেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও যুগোপযোগী করে, বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। দেশের উচ্চ উৎপাদনের এমন ধারাবাহিকতায় ইলিশ উৎপাদনে আমরা সারাবিশ্বে আমরা প্রথম স্থান, মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ স্থান, চাষের মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছি। এই অবস্থানকে টেকসই করার জন্য নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, পরিবহন, বাজার-জাতকরন এবং মুল্য সংযোজন কার্যক্রমকে গতিশীল এবং সুলভ করতে হবে। হীমায়িত পণ্য রপ্তানীতে আমরা ২য় স্থান থেকে ৮ম স্থানে নেমে আসছি আরো ৯ বছর আগে। মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষীবান্ধব উদ্দোগ ও ব্যাবস্থাপনার অভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছি আর সেই সুযোগে দেশের বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে বিদেশী জাতের মাছে। চিংড়িমহল ব্যবস্থাপনায় কোন নীতিমালা নাই। জলমহাল ইজারাকালে প্রকৃত মৎস্যজীবিরা বঞ্চিত, মৎস্য পোণা রপ্তানিতে আইন বাধা। খাদ্যে ও বিদুৎতে নেই সরকারী প্রণোদনা, নেই সহজ শর্তে বর্গা চাষীর ব্যাংক ঋণের ব্যাবস্থা, নেই মৎস্য, চিংড়ি ও মৎস্য পোণা উৎপাদনকারী খামার মালিকদের সংগঠনের সনদ প্রদানের ক্ষমতা। সরকার বানিজ্যিক খামারিদের সুযোগ দিলেও এন বি আর-এর এস আর ও-তে মৎস্য খামারের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট না থাকায় সামাজিক ন্যায় বিচার এখনও প্রভাবশালীর পক্ষে। নেই ইউনিয়নের মৎস্য সম্প্রসারণে দক্ষ জনবলের মর্যাদা। এই নেইগুলোকে দূর করতে পারলেই মৎস্যজীবীর, মৎস্যচাষীর আর্থসামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হবে ও বৈদেশিক রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য, চিংড়ি ও মৎস্য পোণা উৎপাদনকারী খামার মালিকদের সংগঠন FOAB-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৎস্য উদ্দোক্তাগণের পাশে থেকে নিরাপদ উৎপাদনে তাদের উন্নয়নে কাজ করে আসছে। আমরা আস্থা রাখি বঙ্গবন্ধু কন্যা মৎস্যবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি।

সার্বিক উন্নয়ন এর স্বার্থে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এইখাতের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা সকলকে জানাতেই জাতীয় মৎস্য কংগ্রেস FOAB সন্মাননা '২২ আয়োজন করা হয়েছে। মৎস্য খাতে সমস্যা ও উত্তোরণের উপায় নিয়ে মুক্ত আলোচনা "FOAB সংকলন '২২" (দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৎস্য সম্পদ বহুমুখীকরণ) স্বরনিকা প্রণয়নে যে সকল ব্যাক্তিবর্গ তাদের অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত শ্রম দিয়ে সযোগিতার করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যে সকল প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোলা সামছুর রহমান (শাহীন)

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (FOAB)
(সদস্য সরকার মনোনীত) বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

দেশব্যাপী ফেয়াব (FOAB)-এর কার্যক্রমের কিছু চিত্র

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস
র‍্যালী

সেমিনার
আয়োজনে
খুলনা

মত বিনিময় সভা-২০১৪ইং

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ খুলনা জেলায় মৎস্য সংক্রান্ত সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের অবদান রাখায় "ফোয়াব" সভাপতি মোল্লা সামছুর রহমান (শাহীন) কে সাফল্য স্মারক প্রদান করেন কেসিসির মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

সূচীপত্র

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ	১৪
বাংলাদেশের কাঁকড়া	২১
মৎস্য খাতের উন্নয়নে চাই বৈচিত্রপূর্ণ উদ্যোগ	২৬
মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণঃ মৎস্যচাষে নতুন বিপব	২৮
মৎস্যচাষে রূপান্তর	৩০
চংড়ি জাহাজে ভাইরাসমুক্ত “মা” চিংড়ি উৎপাদনের উপর গবেষণা	৩২
মাছ চাষের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ	৩৪
মাছ চাষের হালচাল	৩৫
বাংলাদেশের প্রথম বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্ভাবনের গল্প	৩৬
বৈচিত্রময় ভ্যালু এডেড কাঁকড়া ও কাকড়াজাত পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানী আয়	৩৮
এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব; ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ	৩৯
শাবানা ফাম প্রডাক্টস	৪৪
সোনার বাংলা হ্যাচারি	৪৫
সফলতার গল্প	৪৬
গণমাধ্যমের চোখে মৎস্য চাষ	৪৬
বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি	৪৮
সর্দার এগ্রো - একজন সফল পাবদা চাষী	৫৬

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

সৈয়দ আরিফ আজাদ
প্রাক্তন মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

মাছ বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অংশ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টিচাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৪.৭৩ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান এবং কৃষিজ জিডিপিতে ২৫.৭২ শতাংশ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। দেশের প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশের বেশি অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। দেশের মানুষ গড়ে জনপ্রতি প্রতিদিন ৬০ গ্রাম চাহিদার বিপরীতে ৬২ দশমিক ৫৮ গ্রাম মাছ বর্তমানে গ্রহণ করছে।

মৎস্য খাতের গুরুত্ব

- বিগত ২০০৮ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.০ শতাংশ।
- গত এক দশকে মৎস্য খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২৮ শতাংশ।
- মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৪১ সালে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়াবে ৯০ লাখ মেট্রিক টন।
- দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪ দশমিক ০৪ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে।
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- দেশে বর্তমান বেকারসংখ্যা ২০২১ সালের মধ্যে ১.৫ কোটিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বর্তমান দারিদ্র্যসীমার হার ২০ শতাংশ ও চরম দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে মৎস্য উপখাত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- গত তিন দশকে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৫ গুণ।
- গত অর্থবছরে (২০১৯-২০) মৎস্য উপখাতের অবদান ৩ দশমিক ৫২ শতাংশ।
- মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ১০ শতাংশ।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর তথ্যমতে স্বাদু পানির উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়।
- ২০০৮-২০০৯ সালে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২ লাখ ৯২ হাজার মেট্রিক টন, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ সালে ৫ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ গত ১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩ শতাংশ।
- গত অর্থবছরে দেশে মাছের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪৫ লাখ ৩ হাজার মেট্রিক টন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মৎস্য উৎপাদন গিয়ে দাঁড়াবে ৪৫ দশমিক ৫২ লাখ মেট্রিক টন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে টাকার অংকে মৎস্য উপখাত থেকে জিডিপিতে যুক্ত হয়েছে ৮২ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৭৪ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা।

ইলিশ সম্পদঃ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

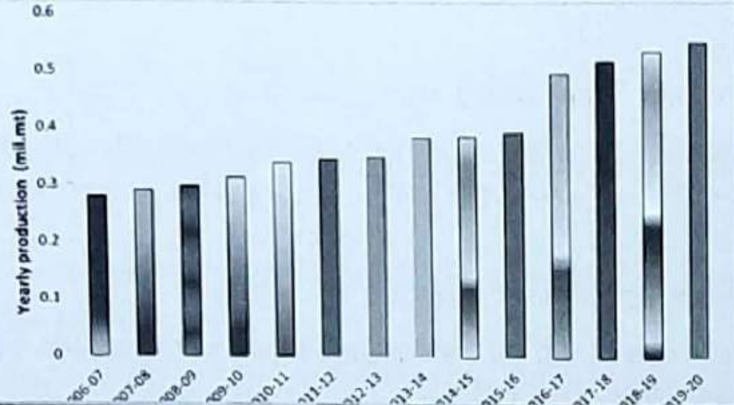

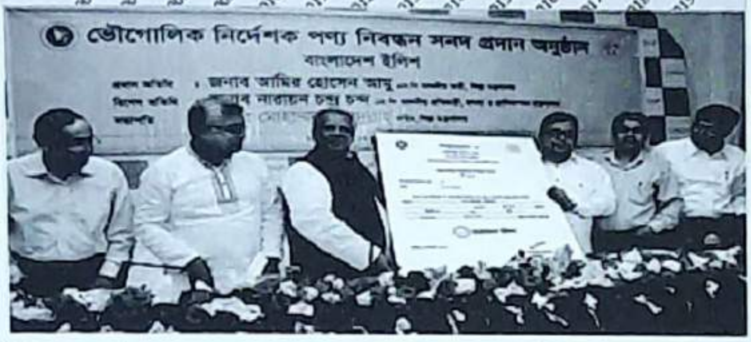
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন সনদ প্রদান অনুষ্ঠান
বাংলাদেশ ইলিশ
জনাব আমির হোসেন আমু

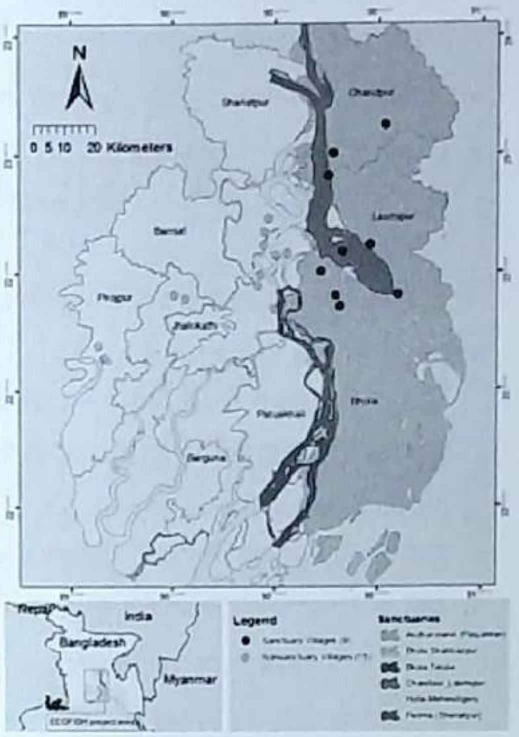
N
0 5 10 20 Kilometers
Shariatpur
Chandpur
Laxmipur
Barisal
Pirojpur
Jhalokathi
Patuakhali
Bhola
Barguna
India
Bangladesh
Myanmar
Legend
Sanctuaries

ইলিশের মাইগ্রেশনে আসতে পারে বড় চ্যালেঞ্জ - সতর্কতা প্রয়োজন!!!!!!

মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম

- আমাদের দেশে প্রায় ৮ শত প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি রয়েছে। এর মধ্যে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ এবং ৪২৬ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ। নতুন আরও ১৮ প্রজাতির মাছ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিজ্ঞানিরা দাবী করছেন।
- নদ-নদী ও হাওর বিলে দেশীয় মাছের পোনা অবমুক্তি ও অভয়াশ্রম (৪২৬টি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বিপন্ন প্রজাতির মাছ সুরক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করছে।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর লাইভ জিন ব্যাংকে ইতোমধ্যে ৮৫ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- বিএফআরআই গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ২৪টি বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে।
- চিংড়ি চাষে ২০১২ সাল থেকে স্থানীয় পোনার পাশাপাশি এসপিএফ (SPF) পোনা ব্যবহার হচ্ছে।
- চিংড়ি ক্লাস্টার ফারমিং ২০১৩ সাল থেকে শুরু হলেও এখন SCMFP প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- প্রচলিত মৎস্য প্রজাতির পাশাপাশি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন কুচিয়া, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, সী-উইড, ওয়েস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ ও চাষাবাদ কৌশল উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।
- বিএফআরআই এর অনুসন্ধানে এ পর্যন্ত ১৩৮ প্রজাতির সীউইডের সন্ধান পাওয়া গেছে; এর মধ্যে ১৮ প্রজাতির সীউইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ৩ প্রজাতির (Sargassum oligocystum, Caularpa racemosa I Hypnea spp.) সীউইডের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত সীউইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তারা ওয়ার্ল্ড ফিশ এর সহায়তায় চাষ শুরু করেছে।

- প্রকৃত মৎস্যজীবী/জেলেদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সাল থেকে ১৬ লাখ ২০ হাজার মৎস্যজীবী/জেলেদের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৪ লাখ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ বছর ইলিশসহ সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে ভিজিএফ সহায়তার আওতায় দেশের মোট ৩৬টি জেলার ১৫২ উপজেলার ৫ লাখ ২৮ হাজার ৩৪২টি পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ১০৫৬৬.৮৪ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া করোনাকালে মৎস্য চাষীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা থাকা সত্তেও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রায় ৭১ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশে ৩৯৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

সুপারিশ (অভ্যন্তরীণ মাছ চাষ ও আহরণ)

- দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ব্যস্ততা বাড়ায় এবং নারী কর্মজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরাসরি খাওয়া উপযোগী কিংবা স্বল্প পরিশ্রমে খাবার উপযোগী মানসম্মত মূল্য সংযোজিত মৎস্য পণ্য উৎপাদন এখন সময়ের দাবী।
- চাষী ভাইয়েরা সাম্প্রতিককালে প্রায়ই বলেন, তারা মাছের ভাল মূল্য পাচ্ছেন না। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যেঃ
  - ✓ আমাদের মাছ থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য (Value added product) তৈরি করতে হবে;
  - ✓ এলাকা ভিত্তিক (যেমনঃ কক্সাজার, সিলেট অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ, মোহনগঞ্জ এলাকা; চলন বিল ইত্যাদি) নিরাপদ শুঁটকি পল্লী সৃজনে মনোযোগ দিতে হবে;
  - ✓ মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে;
  - ✓ স্বাদুপানির মাছ রপ্তানিতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
  - ✓ বাঁচাতে হবে আমাদের হালদা নদীকে-যেখানে রুইজাতীয় মাছ প্রাকৃতিকভাবে ডিম ছাড়ে। আনন্দের বিষয় যে, হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে নানবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
  - ✓ তবে হালদা নদীকে সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি পৃথক "হালদা নদীব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ" (Halda River Management Authority).
- দেশে ইতোমধ্যে স্থাপিত মৎস্য আভয়াশ্রম গুলোর একটি ডাটাব্যাজ তৈরি করে প্রতিটির জন্য কমিউনিটির অংশগ্রহণে ব্যবস্থাপনা কাজ চলমান রাখা। এ জন্য পৃথক জনবল ও বরাদ্দ যুক্ত করা।
- বিল নার্সারি কাজ চলমান রাখা।
- পোনা অবমুক্ত কাজে কমিউনিটিকে যুক্ত করা এবং স্থানীয় সরকারের মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনায় কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা (উপজেলা চেয়ারমান এবং ইউপি চেয়ারমানকে কার্যকর ভাবে যুক্ত করা) প্রতিটি ইউনিয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের স্থায়ী কমিটিকে কার্যকর করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিটি ইউনিয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জন্য উপজেলার ২.৫% বরাদ্দ কাজে লাগানো।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের যেমন আত্মতৃপ্তির সুযোগ আছে, ঠিক তেমনি আমাদের সামনে রয়েছে বড় কয়েকটি চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছেঃ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও মাছের আবাসস্থলের অবক্ষয়।
- তা ছাড়া দেশে মাছের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের আরেকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চাষাবাদে মানসম্পন্ন উন্নত জাতের মাছের পোনা।

- স্বল্প মূল্যের মৎস্য খাবার প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

  প্রানিজ আমিষের উৎস স্থায়িত্বশীল নয় বিধায় সয়াবিন এবং ভুট্টা আবাদ বাড়ানো।
- এ জন্য দেশের ৯ শতাধিক হ্যাচারিতে ভালো মানের পোনা উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের ব্রুড মাছের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্বা ও প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই বাড়াতে হবে।

- ফিনফিশ সংরক্ষণ, স্টোরেজ, প্রসেসিং, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ভ্যালু এডিশান, রপ্তানি করার জন্য রি-ফাইন্যান্স স্কিম চালু করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত শুঁটকির ব্যাপক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দেশে অঞ্চল ভিত্তিক "নিরাপদশুঁটকি মহাল" চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ এই কাজটি BFDC এর আওতাভুক্ত।
- ফিনফিশ উৎপাদনকারিদের - বিশেষ করে যারা রপ্তানিতে অংশ নিতে ইচ্ছুক - তাদের একটি ডিজিটাল ডাটাব্যাজ তৈরি করা - এটি ট্রেসেবিলিটির জন্য অপরিহার্য।
- উৎপাদন হাব - যথা ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা ইত্যাদি এলাকায় - ছোট ছোট স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি সৃজন।
- জলবায়ু পরিবর্তন সূচক বিবেচনায় জলবায়ু-সহিষ্ণু এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল মাছ চাষে মনোযোগ দেয়া।
- মাছের অভয়আশ্রম রক্ষায় উপযুক্ত মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা এবং বাজেট বরাদ্দ।
- আবাসস্থল রক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী প্রোগ্রাম গ্রহণ।
- IPRS, RAS এসব পুঁজি-নির্ভর প্রযুক্তি বিস্তারে যথাযথ সরকারি উৎসাহ, পরামর্শ ও প্রণোদনা প্রদান।
- R&D খাতে যথাযথ বাজেট ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা।

চিংড়ি চাষে সমস্যা ও সুপারিশ

বর্তমানে দেশে প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার ৫০৯ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

সমস্যাঃ

- ✓ নিম্নহারে উৎপাদন
- ✓ এক্সপোর্ট এর সুবিধার ১০-১৫% ব্যবহার
- ✓ ৬০ এর দশকের স্লুইসগেট
- ✓ অভ্যন্তরীণ খাল/ নালা পলিজমে ভরাট - ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাব
- ✓ ঘেরে পানি ১ - ১.৫ ফুট
- ✓ প্রযুক্তি জ্ঞান এর অভাব
- ✓ প্রযুক্তি ব্যবহার খুবই সীমিত
- ✓ কক্স বাজারে হ্যাচারি
- ✓ প্রাকৃতিক ব্রুড ও পোনার নির্ভরশীলতা
- ✓ এসপিএফ পোনার সীমিত ব্যবহার
- ✓ রোগ বালাই
- ✓ প্রাকৃতিক বিপর্যয়
- ✓ ক্লাস্টার ও কন্ট্রাক্ট ফারমিং এর অভাব
- ✓ ঋণ প্রাপ্তির অসুবিধা
- ✓ ভূমি ব্যবস্থাপনায় দ্বৈত প্রশাসন
- ✓ অকার্যকর ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ✓ দীর্ঘদিন ধরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কমিউনিটির দ্বন্দ্ব
- ✓ চিংড়ি নীতিমালার সীমিত প্রয়োগ
- ✓ সাপাই চেন এর দুর্বলতা
- ✓ অপ্রতুল ল্যান্ডিং সুবিধা
- ✓ পরিবহণে কুল চেইনের অভাব
- ✓ উৎপাদন খরচ বেশী
- ✓ যথাযথ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ফাসিলিটিজ সীমিত
- ✓ গবেষণা সীমিত

চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ

- মৎস্য অধিদপ্তর ২০১৩ সাল থেকে সীমিত আকারে ক্লাস্টার ফারমিং করে হেক্টরে ১২০০ কেজির মত উৎপাদন পায় - যা সচরাচর ৩০০-৪০০ কেজি
- ক্লাস্টার ফারমিং ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন - ডিওএফ এর SCMFP এর মাধ্যমে আগামীতে ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নের সুযোগ- সেটা যেন অংশগ্রহণমুলক হয়
- WorldFish Solidaridad সহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে
- এ ছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ২০১৩ সাল থেকে চিংড়ি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শে পরিবর্তন এনে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ দিয়ে আসছেঃ
    - ✓ ঘেরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ৩ ফুট রাখা
    - ✓ পরিকল্পিত নার্সারী স্থাপন করা
    - ✓ ভাইরাসমুক্ত বাগদার পোনা মজুদ করা ও নিয়মিত সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করা
    - ✓ কোন অপদ্রব্য (যেমন: গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, রাসায়সিক দ্রব্য ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা)
- এতে কিছু সাফল্য আসলেও ব্যাপক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়নি
- BFFEA ২০১৩ সালে সাফল্যের সাথে কক্সবাজারে আধানিবিড় চাষে ৫০০০ মেট্রিক টন/হেক্টর উৎপাদন করে - কিন্তু তারা তা ধরে রাখেনি
- তবে প্রায় ১০০ এর বেশি উদ্যোক্তা এই রকম উৎপাদন করে আসছেন
- কন্ট্রাক ফারমিং এর জন্য দীর্ঘ ১০ বছর ধরে BFFEA কে অনুরোধ করা হচ্ছে কিন্তু তেমন কেউ এগিয়ে আসেননি - এটা ব্যাপকভাবে সরকারের পক্ষে করা সম্ভব না
- তাছাড়া এই শিল্পের অনেকেই ভেনামি চিংড়ি চাষ করতে না পারাকে বড় কারণ হিসেবে উলেখ করেন
- কিন্তু পুঁজির আভাব, অবকাঠামোর অভাব, প্রযুক্তি পরামর্শে দুর্বলতা এসব কারণে আধানিবিড় চাষ ব্যাপ্তি লাভ করছেনা
- Bagda shrimp এর GI স্বীকৃতি সহসাই হতে পারে-এটা হবে এক বড় অর্জন
- ভেনামি জাতের চিংড়ি চাষের সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে - তবে এ নিয়ে বিএফআরআই এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রয়োজন
- নীতিমালায় সমন্বয় প্রয়োজন - চিংড়ি মহাল ইজারা - ব্যবস্থাপনায় অনেক মাথাভারি প্রশাসন

- Embankment and Drainage Act 1952
- The Government Fisheries Protection Ordinance 1959
- Bangladesh Water and Power Development Board Ordinance 1972
- Territorial Water and Maritime Zones Act 1974
- Manual for Land Management 1990
- Shrimp Estate management Ordinance 1992
- Water Resources Planning Act 1992
- The Shrimp Culture Users Tax Ordinance 1992
- Environment Conservation Act 1995
- National Land use policy 2002
- Integrated Coastal Zone Management Policy 2005
- The Code of Conducts for Bangladesh shrimp industry 2011
- The Wildlife (Conservation and Security) Act 2012
- Shrimp policy 2014 + MoFL/DoF Acts and Rules

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ চিংড়ি পাওয়া যায়, যার পরিমাণ ৪৭.৬৩ টন । ওই বছর চিংড়ি রপ্তানি থেকেও সর্বোচ্চ ৫৫০ মিলিয়ন ডলার আয় হয় । তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে চিংড়ির যোগান ও রপ্তানি আয়-দুটোই কমছে ।
- কোভিড পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পর চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে চিংড়ি রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বাড়লেও কাঁচামাল বা চিংড়ি সংকটের কারণে বিপুল রপ্তানি চাহিদা সত্ত্বেও বন্ধ রয়েছে ১৩২টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা । সক্ষমতার এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে কোন রকমে চালু আছে ৪৮টি কারখানা ।
- আমলাদের অতিরক্ষণশীল মনোভাব ও ব্যবসায়ীদের এবং একশ্রেণীর অসাধু মধ্যস্বত্বভোগীর অতিরিক্ত লোভ এর পেছনে দায়ী (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যা চিংড়ি চাষ ও রপ্তানি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে - এর পর ২০০৯ পরবর্তী সময়-------)
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সনদপ্রাপ্ত ১০৫ কারখানার মধ্যে ৫৭টি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায় [https://www.tbsnews.net/bangla/ ৯ ডিসেম্বর ২০২১]

সুপারিশঃ

SHAB and BAPCA এর সাম্প্রতিক সুপারিশমালা উলেখ করা যেতে পারেঃ

১. ক্ষুদ্র চিংড়ি চাষীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

২. বিনা শুল্কে মাছ ও চিড়ি চাষের খাদ্য এবং উপকরণ আমদানির সুযোগ ।

৩. বিনা শুল্কে আমদানি করা হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের উপকরণের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ ।

৪. সুলভ মূল্যে মাছ ও চিংড়িচাষ উপকরণ বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরীবিক্ষণ ।

৫. হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের উপকরণসমূহ আমদানির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের দেয়া অনাপত্তি পত্রে উলেখিত শর্তাদির অতিরিক্ত শর্তাদি আরোপ ও তা ছাড়করণে বন্দরে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন ।

৬. সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় আমফানের কারণে চিংড়ি খামারগুলি পাবিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা বেড়িবাঁধ, পয়ঃপ্রণালি এবং ক্ষতিগস্ত পুকুর/ ঘেরেগুলির পুনর্বাসনের জন্য জরুর ও সমন্বিত উদ্যোগ ।

-------- এসব সুপারিশ পরিক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ।

অন্য যেসব স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

- অবকাঠামোতে ব্যাপক সংস্কার - স্লুইসগেট বেড়িবাঁধ ইত্যাদি - পাউবো এর সাথে সমন্বয় স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া - জেলা উপজেলার কমিটির ToR সংশোধন
- অভ্যন্তরীণ পানি সঞ্চালন - কানেক্টিভিটির ব্যা পক সংস্কার - খাল, নালা, ঘের
- ঘেরে পানির গভিরতা বৃদ্ধির - অন্ততঃ ১ মিটার করার সমন্বিত উদ্যোগ
- পাউবো এর সাথে সমন্বয় করে ঘেরে পানি সরবরাহে বিদ্যমান আইনি সমস্যার সমাধান - কৃষকদের সাথে সমন্বয়ে স্থায়ী
- চিংড়ি পিএল স্টকিং পর্যায়ক্রমে একেবারে বন্ধ করে জুভেনাইল স্টকিং
- এজন্য পর্যাপ্ত নার্সারি স্থাপনে সংশ্লিষ্টদের মটিভেট করা এবং অবকাঠামোতে সংস্কার
- পিসিআর ল্যাব এর সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারি স্থায়ী জনবল সৃষ্টি এবং চিংড়ি হ্যাচারিতে বেসরকারি ল্যাব স্থাপনের জন্য কারিগরি ও আইনি কাঠামোর প্রয়োগ
- কন্টাক্ট গ্রোয়িং ব্যবস্থা প্রচলন - BFFEA/DoF/NGO/Famers Association
- লেভিং, সাপাই, স্টোরেজ, মারকেটিং প্রতি স্তরে মান উন্নয়ন - TCP support can be solicited from FAO by DoF – Then programme support from GoB
- ব্যাঙ্কিং নীতিমালা সংশোধন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খমারিদের collateral security ব্যাতিত মূলধন যোগান
- বড় উদ্যোক্তাদের রিফাইনেন্সিং স্কিমে অন্তর্ভুক্তি

- নন-ট্যারিফ বাঁধা দূর করা
- বিদেশী দুতাবাসে বাংলাদেশের ইকোনমিক কাউন্সিলরগণকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো
- চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মান বাড়াতে কারখানা আধুনিকায়ন
- প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা - ৫০০০ কোটি টাকার কত পেল মৎস্য খাত?
- সরাসরি উৎপাদকদের প্রণোদনার আওতায় আনা - এখন শুধু রপ্তানিকারকগণ সুবিধা পান
- বিনা শুল্কে মাছ ও চিড়ি চাষের খাদ্য উপকরণ আমদানির সুযোগ দেয়ার পরও কেন খাদ্য মূল্য কমেনি তা দ্রুত পরিক্ষার নিরিক্ষার ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের করা দরকার
- কৃষিখাত হিসেবে মৎস্য ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে
- চিংড়ির অভ্যন্তরীণ বাজার জরিপ ও মান উন্নয়ন -----

কতিপয় সাধারণ সুপারিশ

১। মৎস্য অধিদপ্তরের শূন্য পদ পূরণ এবং সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও যুগোপযোগীকরণ

২। বিএফডিসি পুনর্গঠন

৩। বিএফআরআই এর বাজেট ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস

৪। মৎস্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস

৫। ক ইকোনমি খাতে বরাদ্দ ও গবেষণা

৬। বায়োটেকনোলজি খাতে বিশেষ গবেষণা মনোযোগ

৭। ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশনের মাধ্যমে উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা মেনে মৎস্য চাষীদের সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

খাদ্য উৎপাদন প্রক্ষেপণ ২০৩১ এবং ২০৪১

(Projections of Demand and Supply of Food by 2031 and 2041)

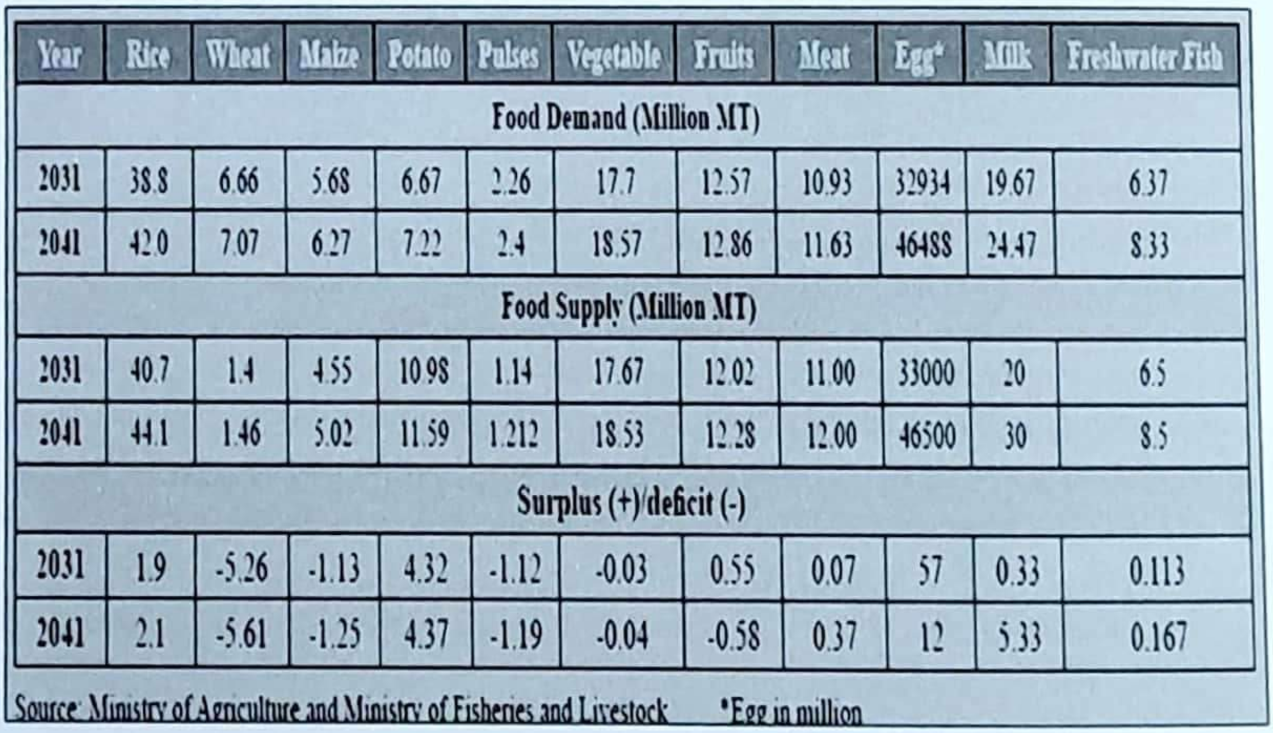

Year	Rice	Wheat	Maize	Potato	Pulses	Vegetable	Fruits	Meat	Egg*	Milk	Freshwater Fish
Food Demand (Million MT)											
2031	38.8	6.66	5.68	6.67	2.26	17.7	12.57	10.93	32934	19.67	6.37
2041	42.0	7.07	6.27	7.22	2.4	18.57	12.86	11.63	46488	24.47	8.33
Food Supply (Million MT)											
2031	40.7	1.4	4.55	10.98	1.14	17.67	12.02	11.00	33000	20	6.5
2041	44.1	1.46	5.02	11.59	1.212	18.53	12.28	12.00	46500	30	8.5
Surplus (+)/deficit (-)											
2031	1.9	-5.26	-1.13	4.32	-1.12	-0.03	0.55	0.07	57	0.33	0.113
2041	2.1	-5.61	-1.25	4.37	-1.19	-0.04	-0.58	0.37	12	5.33	0.167

Source: Ministry of Agriculture and Ministry of Fisheries and Livestock *Egg in million

বাংলাদেশের কাঁকড়া

ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী
গবেষক, কনসাল্টটেন্ট ও
সাবেক প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ভুমিকা

বাংলাদেশের উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সামুদ্রিক মাৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। বাংলাদেশে স্বাদু পানি ও লোনা পানিতে ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে ম্যাড ক্র্যাব (Scylla serrata) অন্যতম। এই কাঁকড়া স্থানীয়ভাবে শীলা কাঁকড়া নামে পরিচিত। এই ১৬ প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে ১২ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায় সমুদ্র বা মোহনা অঞ্চলের লোনা পানিতে। বাংলাদেশের মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান।

কাঁকড়া ভৌগোলিকভাবে ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং বানিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কাঁকড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের নিকট অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সাদা দাগ রোগের (White Spot Disease) প্রাদুর্ভাবের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়ার চাষ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কাঁকড়ার চাষ আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বিকল্প ফসল হিসাবে আবিভর্ভূত হয়েছে এবং খুব দ্রুত কাঁকড়ার চাষের বিস্তৃতি ঘটেছে, যাহা অত্র এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত জনগণের আয়ের একটি উৎস ও জীবিকায়নের উপায় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে, কাঁকড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী থাকা, সহজ চাষ পদ্ধতি, বিরূপ আবহাওয়ার প্রতি দ্রুত সংবেদনশীল, উৎপাদনের সময়কাল (Production cycle) অনেক কম, অধিক মুনাফা ও আন্তর্জাতিক বাজারে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কাঁকড়া চাষের ব্যপকতা বাড়ছে।বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষের প্রধান অন্তরায় হল কিশোর কাঁকড়ার প্রাপ্যতা। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ হচ্ছে তা সম্পুর্ণভাবে প্রকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীল। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে প্রকৃতিতে কাঁকড়ার প্রাপ্যতা কমে যাবে এবং কাঁকড়া শিল্প ও জীব-বৈচিত্র হুমকির মুখে পড়বে।

সুন্দরবন এলাকায়ই প্রায় লক্ষাধিক নারী ও পুরুষ এ পেশার সাথে জড়িত এবং উলেখযোগ্য দরিদ্র নারী পুরুষ কাঁকড়ার পোনা আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। কাঁকড়া আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত না হলেও, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুষ্টিসম্মত খাদ্য হিসেবে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাজারে ডিম্বাশয়পূর্ণ কাঁকড়ার চাহিদা ও বাজার মূল্য সর্বাধিক। বিদেশে কাঁকড়ার চাহিদা থাকায় কাঁকড়া চাষ এবং এর রপ্তানির বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের রপ্তানীকৃত মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান। কাঁকড়া চাষ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা হতে নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। যার চাহিদা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাঁকড়া

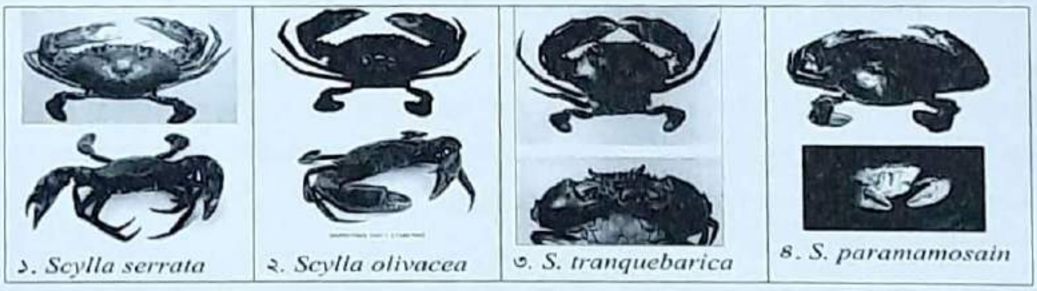

১. *Scylla serrata* ২. *Scylla olivacea* ৩. *S. tranquebarica* ৪. *S. paramamosain*

চিত্রে (১-৪) Scylla গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ ০৪টি প্রজাতির কাঁকড়া প্রদত্ত হল।
তবে বাংলাদেশে Scylla serrata I Scylla olivacea-এর প্রাপ্যতাই বেশি।

কাঁকড়ার বাসস্থান

- কাঁকড়া সাধারণতঃ উপকূলীয় মোহনায় ম্যানগোভ এলাকায় নরম কর্দমাক্ত তলদেশে গর্ত করে বসবাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন চ্যানেলে এরা বিচরণ করে।
- শীলা কাঁকড়া সাধারণতঃ ২ পিপিটির স্বল্প লোনাপানি হতে সামুদ্রিক পরিবেশে বাস করতে পারে। সমুদ্র উপকূল হতে ৪০-৫০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে বঙ্গোপসাগরেও এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
- বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, বরিশাল, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দীপ ও সুন্দরবনের দুবলার চরে এই কাঁকড়ার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে খুলনা এবং চকোরিয়া সুন্দরবন এলাকায় এদের আধিক্য বেশী।

কাঁকড়া মজুদের চিত্র

উপকূলবর্তী কাঁকড়া আহরনকারী ও স্থানীয় জেলে এবং উপজেলায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ বার্ষিক জরীপ কার্য্য চালানো হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালে আহরিত কাঁকড়ার পরিমাণ ১৩১৬০, ১৪২২১, ১১৭৮৭, ১২০৮৪ এবং ১২৫৬২ মেট্রিক টন (চিত্র ৫)। ২০১৬-১৭ সালে আহরিত কাঁকড়ার পরিমান বেড়ে ১৩১৬০ মেট্রিক টন থেকে ১৪২২১ মেট্রিক টন-এ উন্নীত হয় এবং শতকরা উৎপাদন হার বেড়ে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৬-১৭ সালে ৮.০৬% বেড়ে যায়। আবার ২০১৬-১৭ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সালে আহরিত কাঁকড়ার পরিমাণ কমে ১১৭৮৭ মেট্রিক টন এ নেমে আসে এবং উৎপাদন হার ১০.৪৩% কমে যায়। ২০১৭-১৮ সাল থেকে ২০১৮-১৯ সালে আহরিত কাঁকড়ার পরিমাণ কিছুটা বেড়ে ১২০৮৪ মেট্রিক টন এ উন্নীত হয় এবং শতকরা উৎপাদন হার কমে ৮.১৮% চলে আসে। সর্বশেষে ২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০ সালে আহরিত কাঁকড়ার পরিমাণ আবারো কিছুটা বেড়ে ১২৫৬২ মেট্রিক টন-এ উন্নীত হয় এবং শতকরা উৎপাদন হার বেড়ে ৪.৫৪% এ উন্নীত হয়।

কাঁকড়ার প্রজনন

উপযুক্ত পরিবেশে বছরের যে কোন সময় ডিম ছাড়তে পারে। তবে আমাদের দেশে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস এদের ভরা প্রজনন মৌসুম। উপকূলীয় মোহনায় স্ত্রী-পুরুষ কাঁকড়া মিলিত হয়ে স্পনিং এর পর হ্যাচিং এর জন্য ৫০ কিমি পর্যন্ত সমুদ্র অভ্যন্তরে ভ্রমণ করে থাকে। স্পনিংপরবর্তী ডিম স্ত্রী কাঁকড়ার পেটের সাথে জালের মতো লেগে থাকে।

- শীলা কাঁকড়ার ডিমের পরিমান ৩০,০০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে; তবে প্রতিটি ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কাঁকড়ার ডিমের পরিমাণ সাধারণতঃ ৮,৫০,০০০-১৫,০০,০০০।
- একটি স্ত্রী কাঁকড়া কমপক্ষে তিনটি ব্যাচে ডিম ছাড়তে পারে; ১ম ও ২য় বার ডিম ছাড়ার সময়ের মধ্যে ব্যবধান ৪১-৪৬ দিন এবং ২য় ও ৩য় বার ডিম ছাড়ার সময়ের মধ্যে ব্যবধান ৩০-৩৫ দিন।
- ডিম হ্যাচিং এর পর ২৫-৩০ দিন সময়ের মধ্যে ৫ টি লার্ভাল ও একটি মেগালোপা পর্যায় অতিক্রম করে কিশোর কাঁকড়ায়।

শীলা কাঁকড়ার জীবনচক্র

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী ১০ টি জেলার ২৬ টি উপজেলায় ২০১৫-১৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কাঁকড়া চাষ এবং গবেষনা প্রকল্পের মাধ্যমে ১. কিশোর কাঁকড়া চাষ (নতুন প্রযুক্তি), ২. পেনে কাঁকড়া চাষ পদ্ধতির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও ৩. খাঁচায় নরম খোলস কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি শুরু করা হয়। এ তিন পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের ক্র্যাবলেটের মূল উৎস্য হল wild stock.

টেকনোলজি ১: কিশোর কাঁকড়া চাষ (চিত্র ৫ ও ৬)
(Tech. 1. Juvenile culture)

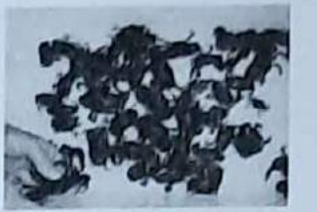

টেকনোলজি ২: পেনে কাঁকড়া চাষ (চিত্র ৭ ও ৮)
(Tech. 2. Crab fattening in pen)

টেকনোলজি ৩: খাঁচায় নরম খোলস কাঁকড়া চাষ (চিত্র ৯ ও ১০)
(Tech. 3. Crab fattening in Cage)

কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি

স্থান নির্বাচনঃ

শীলা কাঁকড়া আধা লবণাক্ত পানিতে বাস করে । তাই বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটির উপর লবনাক্ততা থাকে এমন পানির জলাশয় নির্বাচন করতে হবে । কাঁকড়া চাষের জন্য নিম্নবর্ণিত কিছু গুনাগুণ থাকা প্রয়োজন । যেমন:

- উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারভাটা নদী সংলগ্ন দোঁআশ বা পলি দোআঁশ মাটিযুক্ত এলাকা সর্বাধিক উপযুক্ত ।
- পুকুরের পাড় আগাছা ও ঝোপঝাড় মুক্ত হবে ।
- দিনের অধিকাংশ সময়ই যাতে সূর্য্যের আলো পড়ে সে ব্যবস্থা থাকবে ।
- পুকুর বন্যা মুক্ত হবে ।
- পুকুরের তলা সমান থাকবে ।
- জোয়াভাটার পুকুরের পানি উত্তোলন ও নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- পুকুরের অবকাঠামো উন্নয়ন (ঘের শুকানো, তলদেশের কাদা মাটি অপসারণ, পাড় সংস্কার ও পাড় বরাবর বানা স্থাপন) ইত্যাদি ও পুকুর প্রস্তুতি (চুন প্রয়োগ, পানি উত্তোলন, সার প্রয়োগ ইত্যাদি) ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে ।

মাটির গুনাবলীঃ

- নরম ও দোআঁশ মাটি
- এসিড সালপেট ও এমোনিয়া গ্যাসমুক্ত মাটি
- জৈব পদার্থ ৭-১২%

পানির গুনাবলীঃ

- লবনাক্ততাঃ ৫-২৫ পিপিটি
- তাপমাত্রাঃ ২২-৩০°C
- পিএইচঃ ৭.৫-৮.৫
- দ্রবীভূত অক্সিজেনঃ > ৪ পিপিএম ।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

- ৩৩ শতাংশের একটি পুকুরের চারপাশ শক্ত খুঁটির সাথে বাঁশের বানা দিয়ে এমনভাবে ঘেরাও করতে হবে যেন বাইরের কোন প্রাণী ঢুকতে না পারে ।
- পুকুরের তলার মাটি শুকাতে হবে ।
- মাটির ওপরের অম্ল ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য তলদেশ জোয়ারের পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে ।
- পানি তুলে ১ দিন পর পানি ছেড়ে ধৌত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ।
- পুকুরের তলদেশ চাষ করতে হবে ।
- শতাংশে ০১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয় ।

পানি উত্তোলন ও সার প্রয়োগঃ

- অবাঞ্চিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ০.২৫ মিলি মিটার ছিদ্রযুক্ত নাইলন জাল দিয়ে চেকে ৩০ সে.মি. পর্যন্ত পানি উত্তোলন করতে হবে ।
- ০৭ দিন পর ৫০০ কেজি/হেক্টর সরিষার খৈল প্রয়োগ করা যেতে পারে ।
- ০৪ দিন পর টিএসপি ও ইউরিয়া ৩:১ অনুপাতে হেক্টর প্রতি ৩৫ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।
- এ সময় পানির গভীরতা থাকবে ০১ মিটার ।

পোনা বাছাই, সনাক্তকরণ ও মজুদঃ

- সমুদ্র উপকূল থেকে জোয়ারের সময় শক্ত প্রকৃতির কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করতে হবে । বাতাসে এরা কমপক্ষে ৪-৫ দিন স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে, পরিবহণে কোন সমস্যা হয়না ।
- সুস্থ, সবল পোনা মজুদ করতে হবে ।
- হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কাঁকড়ার পোনা ছাড়তে হবে ।
- মজুদকৃত পোনা একই আকারের হওয়া ভাল । কারণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও দূর্বল পোনা শক্তিশালী পোনার খাবার হওয়ার সম্ভবনা থাকে ।

খাদ্য প্রয়োগঃ

- কাঁকড়া নিশাচর ।
- জোয়ারের সময় এরা দিনেও সাঁতার কেটে খাদ্য শিকার করে ।
- ছোট অবস্থায় এরা ডায়াটম, রটিফার, আর্টিমিয়া খেতে পছন্দ করে ।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন হয় ।
- এ সময় চিমটা পা দিয়ে জীবন্ত খাদ্য শিকার করে ।
- এ সময়ে এদেরকে জীবন্ত বা মাংসালো খাবার সরবরাহ করতে হবে ।

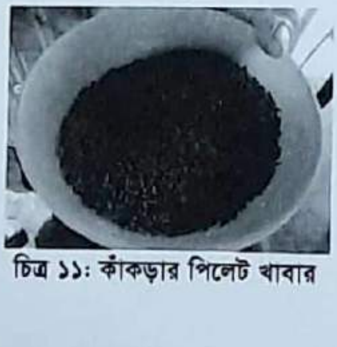
চিত্র ১১: কাঁকড়ার পিলেট খাবার

চিত্র ১২: ট্রাস ফিস (কাঁকড়ার খাবার)

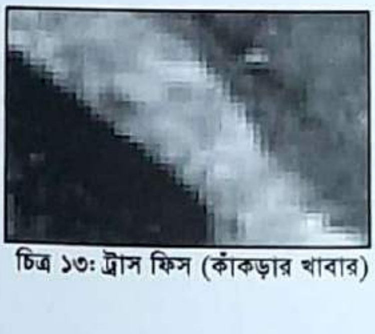
চিত্র ১৩: ট্রাস ফিস (কাঁকড়ার খাবার)

লক্ষ রাখতে হবেঃ

- সরবাহকৃত খাবার চাহিদার তুলনায় কম না হয়।
- অন্যথায় একে অন্যকে খেয়ে ফেলবে।
- অবশ্যই আপদকালীন সময়ে আশ্রয়স্থল হিসেবে প্লাস্টিকে পাইপ খণ্ড খণ্ড করে সরবরাহ করতে হবে।
- ফিডিং ট্রে তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ খাবার খাবার সরবরাহ করে খাবারের চাহিদা নিরূপন করতে হয়।
- দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শামুক, ঝিনুকের নরম মাংস, ট্রাশ ফিশ তেলাপিয়া), ছোট চিংড়িও চিংড়ির মাথা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সাধারণত দৈনিক মোট দেহ ওজনের ৮-১০% হারে খাদ্য সরবরাহ করা ভাল।

কাঁকড়া আহরণঃ

কাঁকড়ার পোনা তথা কিশোর কাঁকড়ার ওজন যখন ৯০ থেকে ১০০ গ্রাম হবে খোলস পাল্টানো বা গোনাড পরেপক্কের জন্য ওদেরকে পেনে বা খাঁচায় তা মজুদ করতে হবে। যেহেতু কাঁকড়া বাতাসেও ৪-৫ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে তাই পরিবহণের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা হয় না।

বাজার ব্যবস্থাপনাঃ

বাংলাদেশে রপ্তানী চাহিদা অনুযায়ী ৯০% কাঁকড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত হয় এবং বাকী ১০% কাঁকড়া চাষীর ফ্যাটেনিং পুকুর থেকে আসে। বাজারজাতকরনের সুবিধার্থে ওজনের ভিত্তিতে পুরুষ কাঁকড়াকে বিক্রীর জন্য XXL, XL, L, M এবং SM পাঁচটি ক্যাটাগরীতে এবং স্ত্রী কাঁকড়ার ক্ষেত্রে F1, F2, F3 এবং KS-1 চারটি ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করা হয়। করোনা (কভিড-১৯) মহামারির পূর্বে XXL সাইজের পুরুষ কাঁকড়ার মূল্য ছিল ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা এবং F1 সাইজের স্ত্রী কাঁকড়ার মূল্য ছিল ২০০০ থেকে ২৪০০ টাকা। করোনা (কভিড-১৯) মহামারির পর XXL সাইজের পুরুষ কাঁকড়ার মূল্য ৬০০ থেকে ৯০০ টাকা এবং F1 সাইজের স্ত্রী কাঁকড়ার মূল্য ছিল ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা দাঁড়িয়েছে এবং কিশোর কাঁকড়া চাষ শূন্যের কোঠায় ও পেনে কাঁকড়া চাষ ৩০-৪০% এ উপনীত হয়েছে।

উপসংহার

হ্যাচারীই হচ্ছে কাঁকড়া চাষের প্রথম ধাপ এবং কাঁকড়া চাষীদের পোনা সরবরাহ করার অত্যাবশ্যকীয় স্থাপনা এবং এই উদীয়মান শিল্পকে স্থায়ীত্বশীল করার মূল উপাদান, যাহার ফলে প্রাকৃতিক উৎস থেকে কিশোর কাঁকড়া আহরণের হার কমাবে ও প্রকৃতিক উৎসকে স্থায়ীত্বশীল করবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাঁকড়ার হ্যাচারী স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বানিজ্যিক হারে ক্রেবলেট উৎপাদন সম্ভব হয়নি। হ্যাচারীতে ক্রেবলেট উৎপাদন সফল হলে, তাদের সহায়তা করার জন্য কাঁকড়ার নার্সারী স্থাপন অত্যাবশ্যকীয়। এই নার্সারীতে ছোট কাঁকড়া/ম্যাগালোপা লার্ভা (Megalopae Larvae) প্রতিপালন করে কিশোর বয়সের কাঁকড়া উৎপাদন করে অন্যান্য চাষীদের (কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ চাষী বা নরম কাঁকড়া উপাদনকারী চাষী) কাছে বিক্রয় করবে। ফলশ্রুতিতে অধিক পরিমাণে কাঁকড়া উৎপাদন হবে, চাষীদের আয়ের পরিমাণ বাড়বে ও তাহাদের জীবিকায়ন স্থায়ীত্বশীল হবে।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাজাওে কাঁকড়ার অধিক মুলয় থাকায় প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত গোনাড পরিপক্ক কাঁকড়া এবং বড় পুরুষ কাঁকড়া সরাসরি বাজারজাত করা হয়। অন্যদিকে কাঁকড়া চাষের ব্যাপক প্রসারের ফলে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়ার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে প্রজননে সক্ষম মা কাঁকড়ার পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে শুরু করায় প্রকৃতিতে উৎপাদিত কাঁকড়ার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় কাঁকড়ার হ্যাচারি নির্মান জরুরী। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাঁকড়ার হ্যাচারী স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বানিজ্যিক হারে ক্রেবলেট উৎপাদন সম্ভব হয়নি। এ অবস্থা থেকে আপদকালীন সময়ে যোগানের জন্য প্রকৃতি থেকে আহরিত কিশোর কাঁকড়া চাষ অত্যন্ত জরুরী। তাই কিশোর কাঁকড়া চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

সমুদ্র উপকূলে কাঁকড়া চাষ দরিদ্র জনগোষ্টির জীবন জীবিকার উৎস । বিদেশে অধিক চাহিদা, চাষ পদ্ধতি চিংড়ীর চেয়ে অনেকটা ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার কারণে কাঁকড়া চাষ এর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে । কাঁকড়া ব্যবসা এবং কাঁকড়া ব্যবসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে । উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও পারস্পারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলাশয়ের ইকোসিস্টেম উন্নয়ন করে আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে কাঁকড়া চাষ সহজতর করতে হবে । কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরী । প্রকৃতির মজুদ বাড়ানোর জন্য প্রকৃতির মজুদ বাড়ানোর জন্য মা কাঁকড়াকে পরিপক্ক হওয়া এবং প্রজননের সুযোগ দিতে হবে । পাশাপাশি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে । সাথে সাথে আগ্রহী কাঁকড়া খামারে হ্যাচারি নির্মানের জন্য উতসাহিত করতে হবে ।

কোভিড-১৯ এর অতিমারির জন্য স্থবির হয়ে যাওয়া কাঁকড়া রপ্তানীর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে । সে সাথে কাঁকড়া চাষীদের ভর্তুকি দিতে হবে এবং বড় চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে। কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর উন্নত প্রযুক্তি বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

মৎস্য খাতের উন্নয়নে চাই বৈচিত্রপূর্ণ উদ্যোগ

প্রফেসর রেজাউল করিম সিদ্দিক
উপস্থাপক, মাটি ও মানুষ, বাংলাদেশ টেলিভিশন

মাছে ভাতে বাঙালী আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত । খাল বিল নদী নালার দেশ এই বাংলাদেশ । একটা সময় এই দেশে প্রাকৃতিকভাবেই অনেক মাছ পাওয়া যেত । কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলাশয় ভরাট করে অপরিকল্পিত আবাসন ইত্যাদি নানা কারণে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র এবং বিচরণ ক্ষেত্র কমে আসে । মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন সীমিত হয়ে আসে এবং মাছের উৎপাদন কমতে থাকে ।

অপরিকল্পিত আবাসনের সাথে সাথে আরেকটি বিষয় জলাভূমিকে বিনষ্ট করেছে, তা হলো শিল্পায়ন । দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের বিকল্প নেই এটা যেমন সত্য তেমনি পরিবেশ কে বিনষ্ট করে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন কখনো ভালো উদ্যোগ হতে পারে না । অপরিকল্পিত ও দায়িত্বহীন শিল্পায়নের ফলে নদী দূষণ হয়েছে এবং বহমান নদী পরিণত হয়েছে বিশাল ড্রেনে। এসবের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হুমকির মধ্যে পরে ।

স্বাধীনতার পর মৎস্য সেক্টরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য । মাছকে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এই খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ।

এখন দেশের মোট জিডিপির ৩.৫২ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপির ২৬.৩৭ শতাংশ রপ্তানী আয়ের ১.৩৯ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান । প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ এই খাতের উপর নির্ভরশীল ।

১৯৮৩-৮৪ সালে মাছের উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০৮-০৯ সালে মাছের উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০১৯-২০ সালে মাছের উৎপাদন ৪৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে মাছের ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে। জাটকা সংরক্ষণ, প্রজণন মৌসুমে বিশেষ ব্যবস্থাপনার কারণে এর উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে।

ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য়। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়সম্পূর্ণতা অর্জন করে।

মৎস্য গবেষণায় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিগুলোর প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগুলো টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ৪র্থ প্রজন্মের রূই উদ্ভাবিত হয়েছে। কাজ চলছে আরো অনেক জাত নিয়ে।

তবে মাছ চাষ সম্প্রসারণে বেসরকারি খামারীরাই প্রধান ভূমিকা রেখেছেন। তাদের হাত ধরে মাছ চাষ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সৃজনশীল উদ্যোক্তারা একদিকে মাছের খামার গড়ে তুলেছেন, আবার এর উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রেখেছেন। মৎস্য রপ্তানীতেও বেসরকারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসেছেন সর্বাগ্রে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মাছের হ্যাচারি, মাছের খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অবদান অনেক বেশি। গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী খামারীদের মিলিত চেষ্টায় মৎস্য সেক্টর এগিয়েছে বহুদূর।

তবে এক্ষেত্রে সমস্যাও কম নয়। মাছের খামারীরা এখনো বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সহায়তা পায়না, শস্য উপখাতে যে ধরনের প্রণোদনা রয়েছে সেগুলো একেবারেই ছিল না এই মৎস্য খাতে। এই কোভিড পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম নগদ সহায়তা দেওয়া হয় যা প্রকৃই খামারীদের উৎসাহিত করেছে।

এই খাতকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে সকল স্তরে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। প্রথম রপ্তানী বাজারকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং এর জন্য উদ্যোক্তা ও সরকারকে সৃজনশীল ভূমিকা রাখতে হবে। বিশ্ববাজারে নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আর রপ্তানী পণ্যকে মূল্য সংযোজনের আওতায় এনে মানসম্মত ও বৈচিত্রপূর্ণ মৎস্য সামগ্রী রপ্তানী করতে হবে। যাতে অল্প পণ্য থেকে বেশি টাকা আয় করা যায়। উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় 'মেড ইন বাংলাদেশ' টাই একটি ভাল ব্রান্ড হিসেবে পরিচিত পেতে পারে।

নিরাপদ মাছ উৎপাদনের জন্য উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন খুবই প্রয়োজন। পোনা উৎপাদন, পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ, উপকরণ প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মাছ উৎপাদনে নিরাপদতার শর্ত রক্ষা করতে হবে। একটি খাদ্য যেন অখাদ্য না হয়ে ওঠে তার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি।

নীল অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নেও কাজ করা জরুরি। সমুদ্র সীমা জয়ের সাগরের নীচে যে অপার সম্ভাবনা আছে সেটিকে কাজে লাগানো দরকার। একদিকে সাগরের নিচের যে সম্পদ আছে সেটিকে কাজে লাগানো দরকার অপর দিকে সেখানকার পরিবেশও বজায় রাখা দরকার যাতে এই সম্পদ কোনো হুমকির মধ্যে না পরে।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, মাছ চাষে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, মাছ চাষে নিরাপদতার নীতি অনুসরণ, মাছ রপ্তানীতে বৈচিত্রকরণ ইত্যকার পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যসম্মদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে অর্জিত হবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, রপ্তানী আয়ের প্রবৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণঃ মৎস্যচাষে নতুন বিপব

Fish Farm Mechanization: Revolution in Aquaculture

আহবায়ক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল (ফোয়াব)
মোঃ এ বি সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা এয়ারেটর।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্যচাষে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদন অবস্থান সেরা ৫-এ। গত তিন দশকে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৫ গুন। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাছ উৎপাদন হয়েছে ২৭ .০১ লক্ষ মেট্রিক টন। তার-ই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। এছাড়াও দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন-জীবিকার জন্য মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল। এ নীরব মৎস্য বিপবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মাছচাষে ব্যাপকহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মাছচাষ একটি লাভজনক খাত হওয়ায় বড় বড় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা মৎস্যখাতে বিনিয়োগ করছে। আবাসান ও শিল্প কারখানা বৃদ্ধির কারনে দিন দিন আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই একই পুকুরে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই। মাছচাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চাষিদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সাথে অযাচিত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনামের মতো আমাদের মৎস্য খামারগুলো যান্ত্রিকীকরণ করে অধিক ঘনত্বে মাছচাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

র্বতমানে সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি খাত হচ্ছে কৃষিখাত। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছে। র্বতমানে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে "আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা-লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ" নামে একটি নতুন দফা সংযোজিত হয়েছে। কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে এ খাতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে বিগত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য খামারের উৎপাদন কয়েক গুণবৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে করে মৎস্য খামারিরা একদিকে যেমন লাভবান হবে তেমনি অপরদিকে দেশও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলোতে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য, পানি সঞ্চালন, অ্যারেশন, পানির গুণগতমান পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি (যেমন সিসিটিভি), অন্যান্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি (যেমন জেনারেটর, আলোর উৎস, পশুপাখি তাড়ানোর যন্ত্র) ও কর্মী ব্যবস্থাপনা মোবাইল ও ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি পাটফরমের মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনা সম্ভব। বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলোর যান্ত্রিকীকরণের কৌশল নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

অ্যারেশন ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণঃ

মাছ চাষের ফলে মাছের খাবার, মলমূত্রসহ বিভিন্ন জৈব পদার্থ পুকুরের তলদেশে জমা হয়, যা পঁচে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টি করে। অ্যারেশনের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে উপকারী অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ক্ষতিকর জৈব পদার্থগুলোকে ভেঙ্গে নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে পুকুরের পানিতে ছেড়ে দেয়। এতে পুকুরের পরিবেশ মাছ চাষের উপযোগী হয়। তাই অ্যারেশন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে অ্যানোরোবিক ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাবে এবং তা পুকুরের তলদেশের জমা হওয়া জৈব পদার্থ ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করে যার ফলে পুকুরে খারাপ পরিবেশ সৃষ্টিসহ মাছ মারা যেতে পারে। অ্যারেশনের মাধ্যমে মাছের

আবাসস্থল উন্নয়ন, পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ উন্নয়ন, ক্ষতিকারক অ্যালজি কম নিয়ন্ত্রণ, পানির দুর্গন্ধ দূর, মাছের রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস এবং সর্বোপরি পুকুরের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায় । পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে যখন মাছ ভেসে উঠে, তখন সাধারণত চাষিরা পুকুরে নেমে সাঁতার কাটে বা বাঁশ দিয়ে পানি আন্দোলিত করে অক্সিজেন বাড়ানোর চেষ্টা করে বা অক্সিজেনের উৎস হিসেবে চাষিরা বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ (Aqua Chemicals) ব্যবহার করে । ফলে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে । এটি পরিবেশবান্ধব এবং এতে চাষিদের ব্যয় অনেকখানিই লাঘব হবে । বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের এয়ারেটর পাওয়া যায় । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্যাডেল হুইল এয়ারেটর, পন্ড সার্জ এয়ারেটর, কেইস পন্ড সার্জ এয়ারেটর, ওয়েভিং সার্জ এয়ারেটর, ডাবল স্পীড এয়ারেটর, ইম্পেলার এয়ারেটর, জেট এয়ারেটর, ফাউন্টেন / ওয়াটার জেট এয়ারেটর, ভেনচুরি এয়ারেটর এবং রুটস বোয়ারর । এছাড়াও পুকুরে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন মৎস্য খামারে অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) স্থাপন করে চাষিরা একদিকে যেমন মাছের খাদ্য প্রয়োগের হার কমাতে সক্ষম হয়েছেন, অন্যদিকে খামারে সঠিক পরিমাণে মাছের খাবার ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণের পরিমাণ হ্রাসের ফলে পুকুরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্যাডেল হুইল এয়ারেটর ও ডাবল স্পীড এয়ারেটরের সমন্বিত অ্যারেশনকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের সবচেয়ে কার্যকরি সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এয়ারেটর ব্যবহারের ফলে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় । বিদ্যুৎ সরবরাহ এর ওপর নির্ভর করে প্যাডেল হুইল এয়ারেটর এবং রুটস বোয়ারর সাধারণত দুই ধরনের হয়; যেমন সিঙ্গেল ফেইজ (১৮০-২২০ ভোল্ট) এবং থ্রি/ডাবল ফেইজ (৩৮০-৪৪০ ভোল্ট) । তবে বাংলাদেশের প্রায় ৯৫% খামারে সিঙ্গেল ফেইজ (১৮০-২৪০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকায় সিঙ্গেল ফেইজ এয়ারেটর মেশিনের চাহিদা বেশি । তাছাড়া বর্তমানে বিদ্যুৎ বিহীন এলাকায় সোলার এয়ারেটরের ব্যবহারও চালু হয়েছে । প্রাথমিক অবস্থায় সোলার এয়ারেটর ব্যয়বহুল মনে হলেও বিদ্যুৎ বিল ও অবকাঠামোগত খরচ হিসেব করলে তা দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়সাশ্রয়ী । মৎস্যচাষ যান্ত্রিকীকরণের অংশ হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদের মাঝে প্রায় ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ)টি প্যাডেল হুইল এয়ারেটর বিতরণ করা হয় ।

এয়ারেটর ব্যবহারের উপকারিতাঃ

১ । পুকুরের সংখ্যা না বাড়িয়ে একই জায়গায় অধিক ঘনত্বে মাছচাষ এবং মাছের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে;

২ । পুকুরের ক্ষতিকারক জৈব পদার্থ ভেঙ্গে তা পুষ্টি উপাদানে পরিণত করার পরিবেশ তৈরি এবং অ্যালগ্যাল কম নিয়ন্ত্রণ করে;

৩ । রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ থেকে মাছ ও চিংড়িকে রক্ষা করে;

৪ । পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস দূর করে;

৫ । এয়ারেটর ব্যবহার করলে ঠান্ডা আবহাওয়াতেও মাছ খাবার গ্রহণ করে; এবং

৬ । পুকুরে এয়ারেটর ব্যবহারের ফলে মাছের উৎপাদন তিন গুন বাড়িয়ে দেয় এবং ঔষধ ও খাদ্য ৩০% কম লাগে ।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার এয়ারেটর আমদানীকারক-এর নিকট হইতে প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ নম্বর ঃ ০১৪০২২২২৩৩৩

মৎস্যচাষে রূপান্তর

ডঃ এফ এইচ আনসারী
প্রেসিডেন্ট, এ সি আই এগ্রিবিজনেস ডিভিশন

মাছ চাষে বাংলাদেশের সফলতা অনেক, এই সফলতাকে ধরে রেখে মাছ চাষকে আরও বেগবান করতে হলে মৎস্য চাষ তথা মৎস্যচাষীদেরকে লাভবান করতে হবে এবং তা করতে গেলে মৎস্যচাষে রূপান্তর অত্যাবশ্যক। ধারাবাহিকভাবে মাছ চাষে রূপান্তর আনতে গেলে এবং একে লাভজনক পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদেরকে কিছু বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমে বলতে হবে আদর্শ পুকুর ব্যবস্থাপনার কথা। যদি সঠিক পদ্ধতি মেনে পুকুর ব্যবস্থাপনা করা যায়, বিশেষ করে যথাযথ নিয়ম মেনে সঠিক মজুদ ঘনত্বে পোনা মজুদকরন, নিয়মিত নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং সুষম খাবার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় তবে মাছ চাষে সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

পুকুর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে চাষকালীন সময়ে দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) এর পরিমাণ ঠিক রাখা এবং তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে অন্যথায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অপরদিকে আমাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে FCR উন্নত করার দিকে। পুকুরে যদি পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবারের মজুদ থাকে তবে সঠিক মজুদ ঘনত্বে নির্ধারিত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগে সর্বোচ্চ উৎপাদন সুনিশ্চিত হবে, ফলশ্রুতিতে প্রয়োগকৃত খাবারের FCR উন্নীত হবে। ফলন যত ভালো হবে ততই উদ্বৃত্ত মাছ ও চিংড়ি- এর রপ্তানি খাতে সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মাছ ও চিংড়ি হতে নিত্যনতুন Value added product তৈরির নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে আমাদের দেশে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য মাছ ও চিংড়ি যেন যথাযথ স্ট্যান্ডার্ড এর হয় যেমন- তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে তা যেন দুর্গন্ধ মুক্ত হয়, এ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণুমুক্ত হয় এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পুকুরের ব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটি থাকলে এবং চাষ পুকুরের পানি নষ্ট হয়ে গেলে সাধারণত এ ধরণের দূর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, আর এ কারনেই আদর্শ পুকুর ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে বিশ্ববাজারে পাঙ্গাশ এর ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাসল ফিলে (Fillet)-এর ব্যপক জনপ্রিয়তা রয়েছে বিধায় এর উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের আওতায় আনতে হবে।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটি সরল সমীকরণ হলো ভালো পোনা, ভালো খাদ্য, ভালো Input (AQUA Medicine), সঠিক পুকুর ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসবে ভালো ফলন ও খামারির সমৃদ্ধি। ভালো পোনা নিশ্চিত করতে মাছ ও চিংড়ি এর কুলপরিচয় (Pedigree) এর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে ও মানসম্মত হ্যাচারী থেকে তা সংগ্রহ করে সঠিক নিয়মে পালন করতে হবে। পাশাপাশি মাছ ও চিংড়ি এর প্রজাতি, বয়স ও আকার অনুসারে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করলে এবং সঠিক পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Input (AQUA Medicine) এর যথাযথ প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত ফলন নিশ্চিত হবে। সফল মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার নিয়মিত সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হলে এবং তা যদি চাষকৃত মাছ ও চিংড়ি নিয়মিত গ্রহণ করে তবে তাদের সঠিক বৃদ্ধি ঘটবে, তাদের বংশবৃদ্ধি সঠিক নিয়মে হবে এবং সর্বোপরি মাছ ও চিংড়ি-এর সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। অপরদিকে মাছ ও চিংড়ি পালনের ক্ষেত্রে নিয়মিত নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা খুবই জরুরী, কারণ নিয়মিত এই দিকগুলো যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে খুব সহজেই পুকুরের সকল ব্যতয় দৃষ্টিগোচর হবে এবং সঠিক পরিচর্যার ম্যাধমে তা সমাধান করা সম্ভব হবে। তাই আমরা বলতে পারি যে ভালো মানের খাবার পরিবেশন, সঠিক নিয়মে নিয়মিত নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই কাজগুলো যদি সঠিকভাবে পালন করা হয় তবে মাছ চাষ করে খামারি নিজের সমৃদ্ধির পাশাপাশি এই উপখাতের টেকসই উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখতে পারবে। পরিশেষে বলা যায় যে স্ট্যান্ডার্ড মেনে যত বেশি উৎপাদন হবে এই উপখাতের টেকসই উন্নয়ন তত দ্রুত ত্বরান্বিত হবে, পাশাপাশি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ির সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ির রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদেরকে চাষ পুকুরে Specific Pathogen Free (SPF) চিংড়ির চখ ও মাছের পোনা মজুত নিশ্চিত করতে হবে, প্রোবায়োটিক্ এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে, চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পানির গুনগত মান নিরীক্ষণ করতে হবে, Good Aquaculture Practices (GAP) এর মাধ্যমে চাষ পুকুরের জৈব নিরাপত্তা বিধান করার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়িকে প্রসেসিং প্যান্টের Quality RM হিসেবে সরবরাহ করার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, ফার্ম থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র প্রতিটি ধাপে এ্রৎধপবধনরষরঃু নিশ্চিত করতে হবে, প্রসেসিং ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে প্রসেসিং প্যান্টের প্রতিটি পর্যায়ে/ধাপে Good Hygiene Practices (GHP) ও Good Manufacturing Practices (GMP) নিশ্চিত করতে হবে, Quality Assurance নিশ্চিত করতে ঐঅঈঈচ ধহফ প্রতিটি পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে, যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (DoF) মাধ্যমে Quality Control & Certification নিশ্চিত করতে হবে, উৎপাদনকৃত মাছ ও চিংড়ি যেন মানবদেহের জন্য নিরাপদ ও আমদানীকারক দেশের মানসম্পন্ন হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় যদি উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ি এর গুনগত মান ঠিক রাখা যায় তবে এই উপখাতের রপ্তানি আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

ইউরোপের বাজারগুলিতে বাংলাদেশ থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ফিনফিশ, ক্যাটফিশ ও চিংড়ির চাহিদা উল্লেখযোগ্যহারে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মৎস্য উপখাতের সমৃদ্ধি ও রপ্তানীযোগ্য মৎস্য উৎপাদন ক্রমশ আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের ফিনফিশ, ক্যাটফিশ ও ব্যাক টাইগার চিংড়ি-এর স্বাদের জন্য ব্যপক জনপ্রিয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত এই প্রজাতিসমূহ সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত বিধায় স্বাদে উত্তম এবং ইউরোপীয় বাজারে এর ভালো চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফিনফিশ, ক্যাটফিশ ও চিংড়ির প্রধান সমস্যা হলো কোয়ালিটি। ফিনফিশ, ক্যাটফিশ ও চিংড়ি যখন পানিতে থাকে তখন যত সমস্যা না হয় তার চেয়ে বেশী সমস্যা শুরু হয় Harvest করার পর। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হলো Harvest থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত উৎপাদিত বিভিন্ন ফিনফিশ, ক্যাটফিশ ও চিংড়ি এর গুণগতমানকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ঐতিহ্যবাহী ব্যাক টাইগার চিংড়ি ও পাশাপাশি উৎপাদিত বিভিন্ন ফিনফিশ, ক্যাটফিশ প্রজাতিসমূহের ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরির মাধ্যমে ভোক্তা পেটে এক নম্বর মানের পণ্য হিসেবে সুপরিচিত করা এবং তা করতে পারলে বাংলাদেশে মৎস্যচাষে রূপান্তর প্রকৃতপক্ষ্যে বাস্তবায়িত হবে।

লেখকঃ

ডঃ এফ এইচ আনসারী, প্রেসিডেন্ট

এ সি আই মোটরস লিমিটেড

এ সি আই এগ্রোলিঙ্ক লিমিটেড

প্রিমিয়াফ্লেক্স পাস্টিকস্ লিমিটেড

এ সি আই ম্যারিন অ্যান্ড রিভারাইন টেকনোলজিস লিমিটেড

এ সি আই এগ্রিবিজনেস লিমিটেড

চিংড়ি জাহাজে ভাইরাসমুক্ত “মা” চিংড়ি উৎপাদনের উপর গবেষণা

সৈয়দ এম ইসতিয়াক, আমানুলাহ চৌধুরী
সুজিত কুমার চ্যাটার্জি ও ড. শফিক আহমেদ

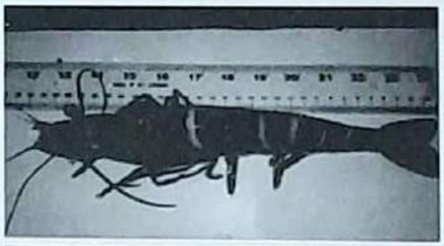

Frozen Shrimp contributes 84% to fisheries product export of which, only Black Tiger (Penaeus monodon) contribute 67% (DoF, 2017). About 36,167 MT shrimps' products were exported in 2017-18 where about 1.80 billion PL were used. These PL's are only 30 percent of the total produced PL in 2017-18. Every year about 70 to 80 percent PL were died due to outbreaks of WSSV. This was happened due to the presence of WSSV in mother shrimp. WSSV is a DNA virus that transmitted from generation to generation vertically and horizontally. WSSV negative mother shrimp can produce WSSV negative PL. on 24 December 2012, the Department of Fisheries has given a circular under rule 9(4) of Hatchery Act 2011 that all the shrimp hatcheries must produce virus-free PL and declare the PL produced in their hatcheries as “virus-free”. Usually, Black Tiger shrimp are breeding intermittently throughout the year. In Bangladesh, mother shrimps are collected from the Bay of Bengal by the Specialized Shrimp Vessel. A study was conducted from November 2015 to May 2016 for producing WSSV negative mother shrimp at the vessel in the Sea. Two shrimp vessels of DSFL of SGR were modified to conduct the tests. After landing the mother shrimp, identified gravid mother, collect tissue, isolated DNA and conducted the test to see the presence or absence of WSSV. Conducted test by a PCR machine at Bangladesh Fisheries Research Institute, Cox's Bazar to validate the results. Found 78 percent WSSV negative mother. This method will help to increase the production and export of Shrimps in Bangladesh.

চিংড়ির অবদান ৬৭ ভাগ (ম.অ ২০১৭). গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদ্রেশ ৩৬,১৬৭ মে.টন চিংড়ি রপ্তানী করে ৩,৫২৭ কোটি বৈদেশীক মুদ্রা আয় করেছে। এই পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদনে কমপক্ষে ১.৮০ বিলিয়ন চিংড়ির পোনা/ পি এল প্রয়োজন হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কক্সাজার ও সাতক্ষিরায় অবস্থিত চিংড়ি হ্যাচারি থেকে ১৪,১২ বিলিয়ন চিংড়ির পোনা/ পি এল উৎপাদিত হয়েছে যার ৩০ ভাগ চিংড়ির পোনা বেঁচে থাকলেও চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ হতো ৮৪,৭১৮ মে.টন যার বাজার মুল্য প্রায় ৮২৬২ কোটি টাকা । চাষীদের এবং সংবাদ পত্রের তথ্যমতে এই বিপুল পরিমাণ চিংড়ি পোনার শতকরা ৮০ ভাগই হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাসে মারা যায়। এই ভাইরাসের ফলে বিগত এক দশকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমান না বেড়ে দিন দিন কমে যাচ্ছে।

হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস/ডবিউ এস এস ভি একটি ডি এন এ ভাইরাস যা বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। সাধারনত যদি মা চিংড়িতে এই ভাইরসটির উপস্থিতি বেশি থাকে তবে পি এল এ তা পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। অনুকুল পরিবেশ পেলেই ভাইরাসটি দ্রুত অন্যান্য চিংড়ির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই একদিনের মধ্যে সমস্ত ফসল ধ্বংস করে ফেলে। সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিলেন "আমাকে একটি ভাল মা দাও, আমি তোমাদের একটি ভাল জাতি দিব।" এই সকল চিংড়ির পোনার একটি মুল উৎস্য হচ্ছে "মা চিংড়ি"। আর এই মা চিংড়ি আহরণ করা হয় বঙ্গোপসাগর থেকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে বঙ্গোপসাগরের ক্রাস্টেশিয়ান প্রাণিগুলোতে ডবিউ এস এস ভি-এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। যে সমস্ত মা চিংড়িতে ডবিউ এস এস ভি নেগেটিভ সেই সব মা চিংড়ি থেকে উৎপাদিত চিংড়ি পোনার বেশিরভাগই ডবিউ এস এস ভি মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২তে হ্যাচারী আইন ২০১১ ৯ (৪) ধারার অধিনে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করেন। প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট বলা আছে যে, সকল চিংড়ি হ্যাচারী ভাইরাস মুক্ত পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করবে এবং পোনার ব্যাগে "ভাইরাস মুক্ত" শব্দটি লিখবে। পরবর্তিতে পোনার সাথে সাথে মা চিংড়ির জন্য একই নির্দেশনা প্রদান করেন। উপরোক্ত বিষয়গুলা সামনে রেখে নভেম্বর ২০১৫ থেকে মে ২০১৬ সন পর্যন্ত সি রিসোর্স গ্রুপের ডিপ সি ফিসার্স এর ২টা চিংড়ি জাহাজে ভাইরাস নেগেটিভ "মা চিংড়ি" উৎপাদনের উপর একটি গবেষনা পরিচালনা করা হয়। ডবিউ এস এস ভি'র উপস্থিতি নির্ধারণের জন্য আমেরিকার তৈরি এক বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ স্টেজের "মা চিংড়ি" পরিক্ষা করা হয় যেখানে ৭৮ ভাগ "মা চিংড়ি" ভাইরাস মুক্ত পাওয়া যায়। ফলাফলগুলোকে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কক্সবাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (সামুদ্রিক)-এর পরিক্ষাগারে পিসি আর এর মাধ্যমে পুনরায় পরিক্ষা করা হয়। দুটি পরিক্ষাতেই একইরকম ফলাফল পাওয়া যায়। পরীক্ষার শুরুতে "মা চিংড়ি" ধরার পর পরই বাছাই করে ৩য় ও ৪র্থ স্টেজের মা চিংড়ি গুলোকে কোয়ারেনটাইন চেম্বারে রাখা হয়। পরবর্তিতে অত্যান্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি স্ট্যান্ডার্ড অনুসরন পূর্বক মা চিংড়ির দেহ থেকে একটি অংশ নিয়ে ডি এন এ আইসেলেশন করে ভাইরাস পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল প্রস্তুত করা হয়। উক্ত স্যাম্পল পরীক্ষা করে ভাইরাসের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিটি অল্প সময়ে সম্পাদন করা যায় বলে একদিনে অনেকগুলো মা চিংড়ি পরিক্ষা করা যায়। এই কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য সাধারন চিংড়ি জাহাজ থেকে ডিপ সি ফিসার্স জাহাজের বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে যা ভাইরাসের হরাইজেনটাল ও ভার্টিক্যাল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

সমুদ্রের মধ্যে মা চিংড়ি আহরণের পরপরই সঠিক পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে ভাইরাস নেগেটিভ মা চিংড়ি উৎপাদন ও সরবরাহ করলে বাংলাদেশের সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি মাছের উৎপাদন ও রপ্তানী অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাইসারমুক্ত থাকার জন্য উত্তম হ্যাচারী ও চিংড়ি চাষ ব্যাবস্থাপনার নীতিসমুহ প্রতিপালন করতে হবে।

মাছ চাষের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

আলমগীর হোসেন

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের পূর্বে মাছ চাষ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না । মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই তা হচ্ছে দুই একজন ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ চাষীরই মাছ চাষ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অপ্রতুল । পুকুর প্রস্তুতি, পানির বিভিন্ন প্যারামিটার, মজুদ ঘনত্ব, খাদ্য প্রয়োগের মতো বিষয়ে চাষীদের প্রাথমিক ধারণা নেই । অধিকন্তু মাছ চাষ বিষয়ে সরকারের একটি বিশেষায়িত বিভাগ আছে, যা উপজেলা পর্যায়ে কাজ করে, সেই সম্পর্কেও অনেকেই জানেন না । এই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি চাষী পুকুর পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিনামূল্যে পানির বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে পরামর্শ প্রদান করতে থাকি । প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন করি । প্রদর্শনীর ফলাফল প্রদর্শনের মাঠ দিবস পালন করি । চাষীরা উৎসাহিত বোধ করতে শুরু করেন । এরই ধারাবাহিকতায় এখন অধিকাংশ চাষীগণই মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অফিসে আসা শুরু করেছেন যা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আশাব্যঞ্জক ।

মাছ চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত সমূহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ও প্রবাসীদের মাঝে মাছ চাষের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হই । যাদের মধ্যে এখন অনেকেরই মূলধনের পরিমান কোটির অংকে পৌঁছে গেছে ।

বেগমগঞ্জ উপজেলার চাষযোগ্য কৃষি জমির ৮০ শতাংশই বছরের অধিকাংশ সময় পানির নিচে থাকে । বছরে একবারই ধান ফলানো হয় । বর্ষা পাবিত এই বিশাল জমিতে মাছ চাষের জন্য দাউদকান্দি মডেল অনুসরণ করে মাছ চাষ করার জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করি । প্রশিক্ষনার্থী বাছাইয়ে ২০-৩৫ বছরের যুবকদের প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করি । আশার কথা, বর্তমানে উলেখযোগ্য সংখ্যক তরুণরা বর্ষাপাবিত ধানক্ষেতে মাছ চাষ শুরু করে দিয়েছেন ।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অনেক প্রবাস ফেরত যুবকেরাও বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেন । তবে যথাযথ কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে অনেকেই ক্ষতি সম্মুখীন হয় এবং অনেকেই মাছ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শুরু করেন । আস্থার সংকট কাটাতে কয়েকজন সম্ভাবনাময় চাষীকে নিয়ে আবারও বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করি । তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেয়া শুরু করি । তাদের মুখের অমলিন হাসিই সাফল্যের স্মারক ।

বানিজ্যিকভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে খামার যান্ত্রিকীকরণ, পানির বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা, ভালো উৎসের পোনা ও সঠিক হারে খাদ্য প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই বিষয় সমূহের উপর একাধিক বার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । অক্সিজেন স্বল্পতা দূর করার ক্ষেত্রে প্রচলিত পন্থা ছাড়াও এরেটরের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করায় এখন অনেক চাষীই এরেটর ব্যবহার শুরু করেছেন । ভালো উৎসের ও সঠিক ঘনত্বে পোনা অবমুক্ত করার সুফল পেয়ে এখন চাষীরাই অন্য চাষীদের উৎসাহিত করেন । সন্মানিত হ্যাচারি মালিকগণও এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভালো মানের পোনা সরবরাহে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন । যা আমাকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার প্রেরণা জোগায় । বানিজ্যিকভাবে মাছ চাষীগণ যেন সার্বক্ষণিকভাবে পানির বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে জানতে পারেন সে জন্য আমি একটি IoT ভিত্তিক ডিজিটাল ডিভাইস তৈরি করার আইডিয়া প্রদান করি যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন শোকেশিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে । বর্তমানে ডিভাইসটির একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে । আমি আশাবাদী শীঘ্রই পাইলটিংয়ের কাজ শুরু করতে পারব ।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বিল নার্সারি স্থাপন, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনাসহ আইন বাস্তবায়নের মতো কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে ।

মাছ চাষের হালচাল

বুলবুল আহমেদ

মাছ বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অংশ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টিচাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যদূরীকরণ ও রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। মোট দেশজ উৎপাদনের ৪ দশমিক ৭৩ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য উপ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। ২০০৮ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ। বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। দেশের রপ্তানি আয়ের ৪ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ আসে এই মৎস্য খাত থেকেই। বর্তমানে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে। দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

বাংলাদেশের মৎস্য খাত যখন বীরদর্পে বিশ্ব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ২০১৯ সালের শেষের দিকে পৃথিবীতে হানা দেয় অদৃশ্য করোনা ভাইরাস। এই জীবাণুর সংক্রমণ রোধে একে একে বন্ধ হতে থাকে বিভিন্ন দেশের সীমানা। বন্ধ হয়ে যায় এক দেশের সাথে অন্য দেশের আমদানি রপ্তানি। থমকে যায় গোটা বিশ্বের অর্থনীতি। ফলে অন্যান্য পণ্যের সাথে বাংলাদেশ থেকে বন্ধ হয়ে যায় মাছের রপ্তানিও। আগেই বলেছি দেশে মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র মাঝারি মৎস্য চাষীরা।

আগেই বলে রাখা ভালো আমার জন্ম বেড়ে ওঠা গ্রামের কাঁদামাটি মেখেই। বাবা ছিলেন একজন আদর্শ কৃষক, ফলে কৃষি কাজ, গবাদিপশু পালন, মাছ চাষের উপর আমার আগ্রহ আছে সেই ছেলে বেলা থেকেই। বাবার সাথে ধান, পাট, সবজি, পশু পালন আর মাছ চাষ করে কেটেছে ছেলেবেলার অনেকটা সময়। আমি বর্তমানে বাংলা টিভিতে একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে কাজ করছি আওয়ামী লীগ বিটে। সাংবাদিকতা শুরুর আগে কৃষি নিয়ে কাজ করার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে তা হয়ে উঠেনি। কারণ দেশে কৃষি সাংবাদিকতা সেভাবে এগুতে পারেনি অনেক কারণেই। তবে দেশ বিদেশের কৃষি নিয়ে শাইক সিরাজ স্যার এবং রেজাউল করিম স্যারের অনুষ্ঠান গুলো আমাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করত কৃষির উন্নয়নে কাজ করতে।

যাই হোক, করোনা যখন সব কিছুকে ঘর বন্ধী করে দিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল প্রান্তিক মৎস্য চাষীদের কথা। কারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে আমি জানি,চাষীর উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত থাকলে তাদের জীবন যাত্রায় কী প্রভাব পড়ে। পরিবার পরিজন নিয়ে কী নিদারুণ কষ্টে কাটাতে হয় সে সব দিনগুলো। সে সময় তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলি আমার কর্মস্থল বাংলা টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ সামাদুল হক স্যারের সাথে ওনার উৎসাহ পেয়ে, আমি যোগাযোগ করি আমাদের জেলা প্রতিনিধিদের সাথে, জানতে চাই কী অবস্থায় আছে ওই অঞ্চলের মৎস্য চাষীরা। এরি মধ্যে ২০২১ সালের ২৬শে মে দেশে আঘাতহানে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। ঝড়ের প্রভাবে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় এবং এর অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। পানিতে ভেসে যায় অসংখ্য ছোট বড় মাছের ঘের।

আমদানি বন্ধে এমনিতেই মাছ নিয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছিল মৎস্য চাষীরা। এবার ঘূর্ণিঝড় ইয়াস তাদের জীবন যাত্রাকে আরও বেশি কষ্টবহ করে তোলে। প্রাথমিক ভাবে আমি খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা অঞ্চলের বেশ কিছু চাষীদের সাথে কথা বলি বাংলা টিভির প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। কথা বলি জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথেও। এরপর সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৎস্য চাষীদের কষ্টের জীবনযাত্রা তুলে ধরে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার শুরু করি বাংলা টিভিতে। কথা বলি ভুক্তভোগী চাষী, ঐ অঞ্চলের মৎস্য কর্মকর্তা এবং ফিস ফার্ম অনার্স এসোসিয়েশনের উর্ধ্বতন কর্তাদের সাথে।

পাশাপাশি যোগাযোগ করি মাননীয় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের সাথেও । সে সময় মাননীয় মন্ত্রী মহদয় ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন । এর ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী করোনায় ক্ষতি মুখে পড়া প্রান্তিক চাষীদের অনুদান প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । আমি বিশ্বাস করি আমার প্রতিবেদনের মাধ্যমে নয় বরং প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অসহায় এসব মানুষ গুলো অনুদানের অর্থ পেয়েছেন । তারপরেও একজন কৃষকের সন্তান এবং একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করি । কারণ লাখো প্রান্তিক মানুষের কষ্টের কথা গুলো তুলে ধরতে পেরেছিলাম । সেদিন কোন প্রাপ্তির আশায় আমি অসহায় মৎস্য চাষীদের পাশে দাঁড়াইনি । প্রাণের ডাকে নিজের দায়বদ্ধতা থেকে তাদের হয়ে কলম ধরেছিলাম ।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষ কোন না কোন ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দেশে এখনো কৃষি সাংবাদিকতার বিকাশ না হওয়া । কিছু গণমাধ্যম সীমিত আকারে কৃষির উন্নয়নে কাজ করলেও বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান কৃষি নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না ।

তবে আমি স্বপ্ন বিলাসী মানুষ সব সময় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি । স্বপ্ন দেখি একদিন দেশের সব গণমাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অপরাধ ও আন্তর্জাতিক বিটের সাথে পালা দিয়ে অগণিত গণমাধ্যমকর্মী কাজ করবে কৃষি বিট নিয়েও । সুন্দর ও সোনালী সে দিনের অপেক্ষায় আমার প্রতিটি প্রহর গোনা ।

বাংলাদেশের প্রথম বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্ভাবনের গল্প

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সিইও, গ্রীনলাইফ বায়ো সাইন্স
An Aqaculture Consultancy Firm

আমি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৯ সালে এমএসসি ফিশারিজ ঢাকা কলেজ থেকে সম্পূর্ণ করি, এবং ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে প্রয়াত শিক্ষক ড. মিয়া মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস এর তত্বাবধায়নে এমফিল সম্পূর্ণ করি, এরপর তার পরামর্শে কক্সবাজার এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে মৎস্য অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের উপর তিন মাসের ট্রেনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করি, কক্সবাজারে বিভিন্ন হ্যাচারিতে প্রায় পাঁচ বছর চিংড়ির পোনা উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার উপর কাজ করি, তারপর দুই বছর গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে চিংড়ি পোনা উৎপাদনের উপর কাজ করি, ২০০৭ সাল থেকে অদ্যবধি মহান আলাহর রহমতে বাংলাদেশের মৎস্য ও চিংড়ি সেক্টরের উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি (কনসালটেন্সি) সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছি, আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে সবসময় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে উৎপাদনের প্রতি আমি অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, তার সাথে সাথে আধুনিক বিশ্বের পরিবেশবান্ধব নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলোর দিকেও আমার নিয়মিত অনুসন্ধান অব্যাহত ছিলো এবং আছে, তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডে একুয়া বায়োমিমিক্রি অর্থাৎ অর্গানিক ফিস ফার্মিং এর উপর একটি ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি আর সেখান থেকেই বটম ক্লিন

রেসওয়ে পদ্ধতিতে মাছ চাষের উপর একটি ধারণা আসে, মাছ চাষে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হচ্ছে একটি পুকুরে মাছের বিষ্টা, পুকুরের অতিরিক্ত খাদ্য, ডেড প্যাংটন, অর্থাৎ পুকুরের তলদেশে যে সমস্ত জৈব বর্জ্য জমে সেগুলি পচে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়, তাই পুকুরের তলদেশ থেকে এইগুলি তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করতে পারলেই পুকুরের পানি মাটির পরিবেশ ভালো থাকে, তাই পুকুরের তলদেশে একটি সেন্ট্রাল পিট বা টয়লেট তৈরি করে এবং পুকুরের পানি ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্য দিয়ে তলদেশে সমস্ত ময়লা কেন্দ্রি করণের মাধ্যমে সেন্ট্রাল পিটে(Central pit) জমিয়ে মাঠ পাম্প এর মাধ্যমে সেটিকে বের করে দেয়া হয় এবং সারা পুকুরে ন্যানো বাবেল এরেটর দিয়ে Dissolve Oxygen (DO) লেভেল বৃদ্ধি করিয়ে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়, বিষয়টি নিয়ে ২০১৯ সালে প্রথম আমার বন্ধু গোয়ালন্দ ফিশারিজের স্বত্বাধিকারী শেখ নিজাম এর সঙ্গে আলোচনা করি এবং সেই প্রথম বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়, এই পদ্ধতিতে একটি পুকুর তৈরি করতে স্থায়ী খরচ অনেক বেশি ও টেকসই এবং প্রথম বছরেই তার একটি পুকুর থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মুনাফা আসে, উলেখ্য যে বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে সাধারণ চাষ থেকে প্রায় ১০গুণ বেশি ঘনত্বের চাষ করা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে বাটন ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে আমার প্রতিষ্ঠান গ্রীনলাইফ বায়ো সাইন্স এর তত্ত্বাবধায়নে পাঁচটি প্রকল্প চলমান।

উলেখ্য যে এই পদ্ধতিতে চাষের মাছ অধিক গুণগত মান সম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়ে থাকে তাছাড়াও এই পদ্ধতিতে চাষকৃত মাসে কোনো দুর্গন্ধ থাকে না এবং খেতে প্রাকৃতিক নদীর মাছের মতো স্বাদ পাওয়া যায়, এই পদ্ধতিটি গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় এক্সপোর্ট কোয়ালিটির উৎপাদিত হয়, এখানে কোনো নিষিদ্ধ পণ্য ব্যবহার হয় না, শুধু প্রবায়টিকস ব্যবহার করা হয়, সুতরাং মৎস্য সেক্টরে উক্ত পদ্ধতিটি দেশের মাছের চাহিদা পূরণে এবং রপ্তানিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

বৈচিত্রময় ভ্যালু এডেড কাঁকড়া ও কাকড়াজাত পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানি আয়

সুজিত কুমার চাটাজ্জী, মোঃ মিজানুর রহমান ও সৈয়দ ইসতিয়াক

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের ধারে অবস্থিত হওয়ায় বৈচিত্রময় এবং বিস্তৃত পরিসরে সামুদ্রিক জলজ প্রাণির ব্যাপকতা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মাছ, চিংড়ি, ঝিনুক, লবস্টার জলজ ইত্যাদি প্রাণিসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি এর একটি বিশাল অংশ রপ্তানিতব্য পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হয়ে আসছে। বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে কাঁকড়া রপ্তানি ক্যাটাগরিতে জায়গা করে নিয়েছে, ফলে সর্বশেষ রপ্তানি নীতি আইন ২০১৮-২১-এর আলোকে কাঁকড়া উপখাতটিকে বিশেষ উন্নয়ন বিভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাণিজ্যিকভাবে জনপ্রিয় কাঁকড়া Mud Crab বৈজ্ঞানিকভাবে "Scylla Serrata" বা "Scylla Olivacea" নামে পরিচিত। উলিখিত উভয় প্রজাতির কাঁকড়া একই পরিবারের অন্তর্গত এবং গুণমান এবং স্বাদে একই রকম তবে আকারে ভিন্ন।

রপ্তানির ক্ষেত্রে কাঁকড়া উলেখযোগ্য রিটার্ন প্রদান করলেও শিল্পটি এখনও স্থায়িত্বশীলতা অর্জন করতে পারেনি। অধিকাংশ কাঁকাড়ার বাচ্চা বা ক্র্যাবলেট প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহিত। চাহিদার আলোকে হ্যাচারি থেকে ক্র্যাবলেটের উৎপাদন নিশ্চিত ও ধারাবাহিকভাকে উৎপাদন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়িক কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা।

কাঁকড়া উৎপাদন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দিন দিন ম্যাড ক্র্যাব বা কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণ জনপ্রিয় হচ্ছে। Mud Crab চাষ বা মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে জেলে, মৎস্য চাষী, ব্যবসায়ী, ফরিয়া, পরিবহনকারী এবং রপ্তানিকারকদের জীবীকা নির্বাহ হচ্ছে। জলবায়ু ও পরিবেশগত অবস্থার অবনতিতেও অভিযোজিত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারায় কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণ চাষী পর্যায়ে খুবই জনপ্রিয়। প্রধানতঃ Mud Crab এর উচ্চ মূল্য, রোগের ঝুকি কম, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনীয় হওয়ায় কাঁকড়া চাষ জলবায়ু পরিবর্তনেও জীবন জীবীকা নির্বাহে অন্যতম উৎস হতে পারে।

বিবরণ	উৎপাদন (মে. টন)		
	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
উৎপাদন	১১৭৮৭	১২০৮৪	১২৫৬২

বিবরণ	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৭	২০১৭-১৬	২০১৬-১৫
হিমায়িত কাঁকড়া	S৭.০ মিলিয়ন	S৬.৮ মিলিয়ন	S৩৩ মিলিয়ন	S9.4 মিলিয়ন	S1.8 মিলিয়ন	S3.9 মিলিয়ন
জীবন্ত কাঁকড়া	S২৪.১		S9.8 মিলিয়ন	S7.9 মিলিয়ন	S16.4 মিলিয়ন	S19.8 মিলিয়ন

তথ্য সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তর

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব; ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

Responsibilities of Bangladesh Coastal Fisheries Resources for SDG (Sustainable Development Goal) Attainment; Future Potentialities and Challenges

সরোজ কুমার মিস্ত্রী
উপপ্রকল্প পরিচালক
সাসটেইনেবল কোষ্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা

Abstract:

There are huge potentialities in aquaculture in coastal area of Bangladesh. The coastal area of Bangladesh is comprised of 19 districts including 146 upazila characterized by brackish water low and high tide. The vast water of the coastal area includes rivers, canals, floodplains and shrimp ghers. Due to availability of vast water make the coastal area more feasible than main land for different type of fish culture. At present, all most 100 percent of the exportable fish come from the coastal aquaculture. Among them a lion share comes from the shrimps and prawns. Still, these have enough scope to make it many folds. Other fishery item such as Crabs, Pungasius, Tilapia, Koi, Vetki, Persia, Tengra, marine algae etc. can make robust our export and local consumption list. Still there are immense scopes to expand and improve aquaculture in the coastal area. Although a lot of problems are encountered to achieve these successes. However, a co-operative and collaborative approach can make it successful.

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল মৎস্য সম্পদের অপার সম্ভাবনাময় এলাকা। বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের ১৯টি জেলার ১৪৬টি উপজেলা নিয়ে গঠিত উপকূলীয় অঞ্চল। সাধারণতঃ জোয়ার ভাটার প্রভাব বলয় যতদুর পাবিত করে সে অঞ্চলকে উপকূল বলা হয়। জোয়ার ভাটার প্রভাবে উজান নদীর মিষ্টি পানি ও সাগরের কড়া নোনা পানি মিলেমিশে তৈরী হয় আধানোনা পানির এক ভিন্ন পরিবেশ, যা কি না দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে মেলে না। কোথাও সারা বছর, আবার কোথাও কয়েক মাস উ''চ, মধ্যম ও নিম্ন মাত্রার লবণ পানি। আবার কোথাও সারা বছর কিংবা বছরের কোন এক সময় একেবারেই মিষ্টি পানি। এ অঞ্চলের মাটি,পানি ও আবহাওয়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে আলাদা বলে উপকূলের জীববৈচিত্র্য ও ফসল বৈচিত্র্যে রয়েছে ভিন্নতা। অসংখ্য নদ নদী, খাল, পুকুর, ডোবা, পাবনভুমি ও মৎস্য ঘের জোয়ারে ডোবে, ভাটায় জাগে। জোয়ার ভাটার বিশাল জলভাণ্ডার এ অঞ্চলকে করেছে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্যের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে নানা পদ্ধতির, নানা জাতের মাছ চাষের অবারিত সুযোগ। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের প্রায় শতভাগ উপকুলীয় অঞ্চলের অবদান। মৎস্য চাষের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই অবদানকে আরও বিকশিত করবার অপার সম্ভাবনা রয়েছে এই উপকূলে। বিশেষ করে উপকূলীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ যেমন গুর''ত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে, তেমনি তা আরও বিকশিত করার রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এ অঞ্চলের উলেখযোগ্য চাষ প্রজাতি মাছের মধ্যে রয়েছে গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, ট্যাংরা, কাঁকড়া, থাই পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ইত্যাদি।

এসকল মাছের একক ও মিশ্র চাষ উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং উঠার সম্ভানা রয়েছে। এছাড়া চাকা চিংড়ি, হরিণা চিংড়ি, পার্শে, ভেটকি, খরশুলা ইত্যাদি মাছ এবং সামুদ্রিক শেওলা চাষের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। আশির দশকের শুরুতে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। লবণ পানির বাগদা চিংড়ি এবং মিষ্টি পানির গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে করেছে মজবুত। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শতাধিক মৎস্য প্রক্রিয়াকারণ কারখানা, অসংখ্য চিংড়ি হ্যাচারী, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা, বরফকল, ডিপো, আড়ৎ বাজার ইত্যাদি। যেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ দিনরাত কাজ করছে এসকল প্রতিষ্ঠানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অভীষ্টলক্ষ্য -১ (দারিদ্র্য বিমোচন), অভীষ্টলক্ষ্য ২ (ক্ষুধামুক্তি), অভীষ্টলক্ষ্য ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ), অভীষ্টলক্ষ্য ৫ (বৈষম্য হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়ন) অভীষ্টলক্ষ্য ১২ (পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন) অভীষ্টলক্ষ্য ১৩ (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলা) ও অভীষ্টলক্ষ্য ১৪ (জলজ জীবন) বাস্তবায়নে সরাসারি ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য সম্পদের যেমন অপার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনগণ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের জীবন জীবিকা, হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখ উপকূলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা করে মৎস্য সম্পদের উত্তোরোত্তর উন্নয়ন ঘটানো সত্যিই চ্যালেঞ্জের বিষয়। গুনগত মান সম্পন্ন চিংড়ির পোনার অভাব, মৎস্য খাদ্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, মাছ চাষের উপকরণের অপ্রতুলতা, দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্যার কারণে এ অঞ্চলের মানুষ বারবার হুমকির মধ্যে পড়ছে। তবুও তারা থেমে না থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য সম্পদঃ

বাংলাদেশের উপকূল মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ এবং চাষকৃত মৎস সম্পদ উভয়ের সুবিশাল ভাণ্ডার ও অমিত সম্ভাবনাময় এলাকা। উপকূলীয় অঞ্চলের অসংখ্য নদ-নদী, খাল বিল এবং দেশের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন সংলগ্ন নদী, মোহনা ও খাল প্রাকৃতিক মৎসের অন্যতম প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র, নার্সারী ক্ষেত্র এবং লালন ক্ষেত্র হওয়ায় অসংখ্য প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়ার অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক মাছের মধ্যে ইলিশ, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, হরিণা চিংড়ি, চাকা চিংড়ি, লোনা চিংড়ি, ভেটকি, মাগুর, পার্শে, ভোলা, তপসে, ফাসা, ট্যাংরা, আইড়, পোয়া, দাতিনা, কাঁকড়া ইত্যাদি। এসকল মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য অত্যধিক। শুধু তাই নয় এসকল মাছের পোনা উৎপাদন করে চাষ করতে পারলে দেশের মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ভেটকি মাছের অত্যধিক চাহিদা রয়েছে বিধায় উপকূলীয় অঞ্চলে এটির চাষ সম্প্রসারণের ব্যপক সুযোগ রয়েছে। এছাড়া হরিণা চিংড়ি এবং চাকা চিংড়িকে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। বাজারে এটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক চাষাবাদ করা সম্ভব হলে উপকূলীয় অঞ্চলে নতুনমাত্রা যোগ হবে। বর্তমানে অনেকেই উপকূলীয় অঞ্চলে ভেনামী চিংড়ি চাষ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ঝুঁকিও রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির হরিণা চিংড়ি এবং চাকা চিংড়ি অন্যতম চাষ প্রজাতি হতে পারে। এছাড়া লোনা ট্যাংরা, দাতিনা, পার্শে ও কাঁকড়া চাষের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত কয়েক বছর উপকূলীয় অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে কাঁকড়া চাষ করে ঈর্ষাণীয় সাফল্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এসকল প্রজাতির চাষ সম্প্রসারণের পূর্বে হ্যাচারি স্থাপন এবং পোনা উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে মুক্ত জলাশয় হতে পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা ঠিক হবে না। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী চাষ হয় গলদা ও বাগদা চিংড়ি। এছাড়া বাগদা ঘেরগুলোতে অল্পবিস্তর পার্শে, ভেটকি, তেলাপিয়া, কার্প ইত্যাদি মাছের চাষ হচ্ছে। বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন থাই পাঙ্গাস, কৈ, কাঁকড়া, মনোসেক্স তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এতে করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পুষ্ঠির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষঃ

দেশের রপ্তানী বানিজ্যের স্থায়ীত্বশীলতা ও সম্প্রসারণের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষ খুবই গুরুত্বপুর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পুর্ব অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। শুধু লবণ পানিতেই নয়, আধা লবণ বা হালকা লবণ পানিতেও বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বর্তমানে একক বা মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে উপকূলের প্রায় ২০৫৬৫৪ হে. জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। শুস্ক মৌসুমে উপকূলীয় অঞ্চলের পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বাড়তে

থাকে, এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা থাকে। এ সময় লবণ পানিতে ধান চাষ করা সম্ভব নয়। তাই জমিটা ফেলে না রেখে জোয়ারের পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। আবার বর্ষাকালে পানি মিষ্টি হয়ে গেলে একই জমিতে আমন ধানের আবাদ চলে। চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত জোয়ারের পলি ও চিংড়ির বর্জ্য জমিকে উর্বর করে। ফলে একই জমিতে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় ও যত্নে আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়। ভবিষ্যতে জলবায়ূ পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে উপকুলীয় অঞ্চল হয়ে উঠতে পারে আরও বেশী ঝুঁকিপ্রবণ। উপকূলীয় অঞ্চলে দিন দিন লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়ত বাগদা চিংড়ি চাষই হবে উপকূলীয় জীবন জীবিকার অন্যতম প্রধান সম্বল। উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির ধরণ ও পদ্ধতি অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে সনাতনী/সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষ, উন্নত সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষ এবং উন্নত/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

সনাতনী/সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষঃ

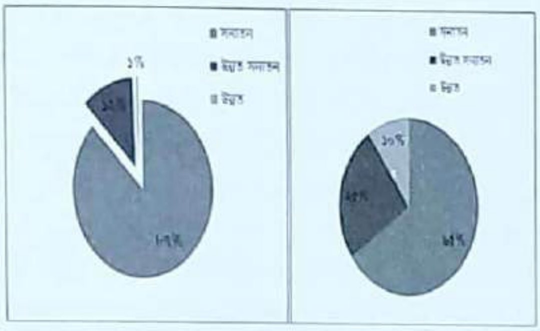

এ চাষ বড়ই সাদামাটা। পোনা মজুদ ও পানি বদল ছাড়া এ চাষে তেমন কোন ব্যবস্থাপনা নেই। বিদ্যমান পরিসংখ্যানের হিসাব মতে বাংলাদেশে ১৮০০০০হেঃ (৮৭%) জমিতে এ চাষ হচ্ছে। এ চাষে উৎপাদন খুবই কম, মাত্র ৩০০-৩৫০ কেজি/হেঃ। খুলনা জেলার পাইকগাছা অঞ্চলের এক সমীক্ষায় দেখা যায় এ চাষে হেঃ প্রতি চাষে হেঃ প্রতি ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করে ১৬২ হাজার টাকার চিংড়ি উৎপাদন হয়, যাতে হেক্টর প্রতি কমবেশী ৮০ হাজার টাকা নীট লাভ থাকে। এ চাষে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি থাকে বেশী আবার ইউনিট প্রতি উৎপাদনও খুব কম। তবে সমম্বিত কৃষি এবং লবণ জল ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহারে এ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম।

উন্নত সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষঃ

সম্প্রসারিত চাষের কিছু খামার উন্নত সম্প্রসারিত খামারে রুপান্তর করা গেলে চিংড়ির উৎপাদন ও লাভ আরও বেড়ে যাবে। এজন্য বিদ্যমান পুকুরের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। পানির গভীরতা ৩ ফুটের কম নয়, তবে ৪ ফুট হলে ভাল হয়। পৃথক নার্সারীসহ অন্যান্য অবকাঠামো কিছুটা উন্নয়ন করতে হবে। ভাইরাসমুক্ত সুস্থ্য ও সবল পোনা সময়মত ও পরিমিত ছাড়তে হবে। সময়মত ও পরিমিত মানসম্পন্ন খাবার প্রয়োগ করতে হবে। এমত ব্যবস্থাপনায় হেক্টর প্রতি ৭০০-৮০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। তখন হেক্টর প্রতি ২.৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে উৎপাদন হবে ৪.৫ লক্ষ টাকার চিংড়ি, এবং হেক্টর প্রতি লাভ দাড়াবে প্রায় ২.০ লক্ষ টাকা। মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে উৎপাদন দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ২৫০০০হেক্টর (১২%) জমিতে এ পদ্ধতির চাষ হয়। বাগদা চিংড়ির চাষের জায়গা আর না বাড়িয়ে এ পদ্ধতির চাষের বর্তমান অবস্থান ১২% থেকে ২৫% উন্নীত করা সম্ভব হলে জাতীয় উৎপাদনে বছরে ২০,০০০ মে.টন অতিরিক্ত চিংড়ি যোগ হবে, যা এ অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করবে।

উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষঃ

বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির চাষ হতে পারে একটি খুবই সম্ভানাময় বিনিয়োগ। স্থানীয় একাধিক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বর্তমানে মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ হেক্টর জমিতে এ পদ্ধতির চাষ হয় এবং উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ৫ মে.টন। অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে এ উৎপাদন ৬-৭ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩০-৩২ লক্ষ টাকার চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। এ চাষে পরিকল্পিত পুকুর, পর্যাপ্ত দুষণমুক্ত পানি, রোগমুক্ত সুস্থ্য সবল পোনা, পুষ্টি সমৃদ্ধ মানসম্পন্ন খাবার, পরিমিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরী। এসব কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত পুঁজির প্রয়োজন। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলায় নদী/খাল সংলগ্ন এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে ধান বা অন্য ফসলের চাষ এখনও লাভজনক নয়। সে সব জায়গায় এ পদ্ধতির খামার গড়ে তোলা সম্ভব। মাত্র বিশ হাজার হেক্টর জমিতে (৯%) এ চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে বছরে অতিরিক্ত এক লাখ মে.টন বাগদা চিংড়ি জাতীয় উৎপাদনে যোগ করা সম্ভব। এ পদ্ধতির চাষ পরিবেশ বান্ধব, নিয়ন্ত্রণযোগ্য, অল্প জায়গায় সম্ভব বলে

সম্প্রসারিত চাষের সামাজিক সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলা সম্ভব । তবে বিনিয়োগ ও চাষের ব্যয় বেশী বলে এ পদ্ধতির চাষ তেমন বাড়ছে না । সেক্ষেত্রে সামর্থবান চাষী ও এন্টারপ্রাইজকে এগিয়ে আসতে হবে । ব্যাংক, বীমা, এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ খাতে বিনিয়োগ করতে হবে । উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষ হতে পারে উপকূলীয় অঞ্চলের সেরা বিনিয়োগ । দেশের চিংড়ি রপ্তানি সমৃদ্ধ করতে হলে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে হবে । সেক্ষেত্রে উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারনের কোন বিকল্প নেই । বাগদা অঞ্চলে এ পদ্ধতির চাষ বিস্তারের অবারিত সুযোগ রয়েছে ।

গলদা চিংড়ি চাষঃ

গলদা চিংড়ি বিশেষ করে উপকূলীয় পরিবেশের অপার সম্ভাবনাময় জলজ সম্পদ । বর্তমানে প্রধানত: খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর জেলার প্রায় ৬৮৭৪৬ (ষাট) হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ির চাষ হয় । উপকূলীয় জমি ও জলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে গলদা চিংড়ি চাষের কোন বিকল্প নেই । সাধারণত: আপার কোস্ট বা দুর উপকূলের হালকা লবণ অথবা মিষ্টি পানিতে এর চাষ ভাল হয় । এ জন্য পৃথক খামারের প্রয়োজন পরে না । এক জমিতেই ধান, শব্জি, মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ হয় । এক জমিতে সব ফসলের সমন্বয়, একমাত্র উপকূলেই সম্ভব হয় । বর্ষা মৌসুমে চিংড়ির বর্জ্য ও খাবারের উচ্ছিষ্ট জমির হারানো উর্বরতা নবায়ন করে । শুষ্ক মৌসুমে একই জমিতে উফসী জাতের ধানের বাম্পার ফলন হয় । পুকুরের পাড়ে নানা জাতের শব্জির আবাদ চলে সারা বছর । গলদা খামারের ক্যানালের পানিতেই ধান ও শব্জির আবাদ চলে । পৃথক সেঁচ ব্যবস্থার প্রয়োজনই পরে না । ফলে উৎপাদন ব্যয়ও তুলনামুলকভাবে কম । সত্যিই-এ এক অভাবনীয় উদ্ভাবন ও দারুণ সমন্বয় । এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি গলদা চিংড়ির উৎপাদন ৪৫০ থেকে ৫৫০ কেজি ও ৩-৪ লক্ষ টাকার চিংড়ি পাওয়া যায় । তবে পরিকল্পিত পুকুর বা খামারে গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস অণুসরণে সারা বছর চাষ করলে এই উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১০০০-১২০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব । তখন চাষীর লাভ শতকরা শতভাগের বেশী হবে । ভবিষ্যতে সিডব্যাংকে পোনা সংরক্ষণ ও সম্পূর্ণ পুরুষ গলদার চাষ এই সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করবে ।

উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া চাষঃ

কাঁকড়া উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সম্ভাবনাময় ফসল । একাধিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ১০ হাজার মে.টন কাঁকড়া সংগৃহিত হয় । যার সিংহভাগ আসে প্রাকৃতিক উৎস-প্যারাবন ও সংলগ্ন নদনদী, খাল, পাবণভূমি এবং চিংড়ি ও কাকঁড়া ঘের হতে । এভাবে আহরিত কাঁকড়ার অর্ধেকেরও বেশী স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় এবং অবশিষ্ট কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানী হয় । বাংলাদেশ রপ্তানী ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রায় ৪ হাজার মে.টন কাঁকড়া রপ্তানী করা হয়েছে । আর্ন্তজাতিক এবং দেশীয় বাজারে কাঁকড়ার প্রচুর চাহিদা রয়েছে । দেশের চাষযোগ্য শীলা কাঁকড়া বা মাড ক্রাব ২-৫০ পিপিটি লবণাক্ততা এবং ১২-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে বিধায় উপকূলীয় অঞ্চল তথা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষীপুর এবং কক্সবাজার অঞ্চলে কাঁকড়া চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে । বাগদা অঞ্চলে ঘেরে খোসা/বীজ কাঁকড়া ছেড়ে বাড়তি ফসল হিসেবে কাঁকড়া আহরণ করা হয় যা সম্পূর্ণটাই সনাতন পদ্ধতি । আজকাল এসব অঞ্চলের বাড়ীর আশেপাশে পতিত, ডোবা, নালা, চরাঞ্চল, চিংড়ি ঘের, নদীর পাড় ইত্যাদি জায়গায় সাধারণত: বাঁশ অথবা সুপারির চটা দিয়ে ছোট বড় যে কোন আকারের কাঁকড়া ঘের স্থাপন করা হয় । এসব ঘেরে কম/অপরিপক্ক/খোসা/নরম কাঁকড়া ছেড়ে গোনাড পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত (২-৩ সপ্তাহ) খাবার দেয়া ও যত্ন নেয়া হয় । এ পদ্ধতিকে কাকঁড়ার মোটাতাজাকরণ বলা হয় । তবে সিনথেটিক/বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ আরও লাভজনক এবং অধিকতর সম্ভাবনাময় । উপকূলীয় দারিদ্র বিমোচনে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ হতে পারে খুবই সম্ভানাময় জীবিকা । খুলনা জেলার দাকোপ অঞ্চলে এক সমীক্ষায় দেখা যায় চারটি খাঁচায় মাসে একটি পরিবার প্রায় ১০ (দশ) হাজার টাকা আয় করতে পারে । পাইকগাছা অঞ্চলে অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় মাত্র ৫ শতাংশ জায়গায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব । বাগেরহাট জেলার, রামপাল, মোংলা খুলনা জেলার দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ, দেবহাটা, শ্যামনগর উপজেলায় এ চাষের উলেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটছে । তবে এসব অঞ্চলে ক্ষুদ্র পরিসরে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ শুরু হলেও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব, বীজ কাঁকড়ার সীমাবদ্ধতা ও পুষ্টি সমৃদ্ধ পিলেটেড খাবারের অভাবে এখনও পর্যন্ত বৃহৎ পরিসরে কাঁকড়া চাষ অথবা মোটাতাজাকরণ শুরু হয়নি । উপকূলীয় অঞ্চলের ৫০ হাজারের অধিক লোক কাঁকড়া আহরণ, মোটাতাজাকরণ ও বিপনণের সাথে জড়িত বলে একাধিক সমীক্ষায় জানা যায় । অত্যন্ত লাভজনক এবং কম ঝুঁকিপুর্ণ এই চাষকে জনপ্রিয় করা সম্ভব হলে অত্র অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

উপকূলীয় অঞ্চলে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষঃ

বিশ্বের অনেক দেশে পেন এবং খাঁচায় মাছ চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া স্কটল্যান্ড চাষের মোট মাছের উলেখযোগ্য উৎপাদন আসে খাঁচায় মাছ চাষ হতে। বাংলাদেশের উপকূলের প্রায় সকল জেলায় নদীর কোল/খাড়ি, উন্মুক্ত পাবনভূমি, মরা নদী, খাল, ইত্যাদি জলাশয়ে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষের সুযোগ রয়েছে। এ চাষের বড় সুবিধা হলো ফসলী জমি নষ্ট না করেও মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি। ফলে যাদের নিজস্ব জমি নেই বা অল্প জমি বা জলাশয় আছে তারাও মাছ করে পারিবারিক পুষ্টি ও জীবিকা উন্নয়ন করতে পারে। বরিশাল অঞ্চলের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া, ৬ ফুট উচ্চতার একটি খাঁচায় ১০০০ তিলাপিয়া পোনা ছেড়ে ৩/৪মাসে ৩৫০/৪০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। খাঁচার অবচয়ন ব্যয় সহ প্রতি ফসলের উৎপাদন ব্যয় দাড়ায় ২৬ থেকে ২৭ হাজার টাকা। উৎপাদিত মাছের মুল্য প্রায় ৩৬ থেকে ৩৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি খাঁচায় প্রতি ফসলে লাভ দাড়ায় ১০ হাজার টাকা। বছরে দুই ফসলে এই লাভ হতে পারে দ্বিগুন। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের পোল্ডার এলাকার আধা উম্মুক্ত নদী ও খালে এ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও নোয়াখালী অঞ্চলে এ চাষ ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাণিজ্যিক ও পারিবারিক-দু'ভাবেই এ চাষ করা সম্ভব। ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টারের আর্থিক সহায়তায় খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হেতালবুনিয়া খালে পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচায় মাছ কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে যা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। আশা করা যায় অচিরেই উপকূলীয় অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। জলবায়ূ পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে ভবিষ্যতে উপকূলের কোন অঞ্চল ডুবে গেলে, সেখানে খাঁচায় মাছ হয়ে উঠবে অন্যতম প্রধান জীবিকা।

উপকূলীয় অঞ্চলে থাই পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও থাই কৈ মাছের চাষঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তেলাপিয়া ও থাই পাঙ্গাস মাছ। উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শত শত হেক্টর জমিতে থাই পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও থাই কৈ মাছের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও কৈ মাছের হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন গড়ে প্রায় যথাক্রমে ৮০-৯০ মে.ট.; ২৫-৩০ এবং ২০-২৫ মেট্রিক টন। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা, গুপ্তমারী, দাউনিয়াফাঁদ, তেতুঁলতলা এখন মৎস্য চাষ পলী। প্রতিদিন কয়েক ট্রাক মাছ এ অঞ্চল হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়ে থাকে। এ এলাকার কোন কোন চাষী বছরে প্রায় ১০০০ থেকে ৩০০০ মে.ট. পর্যন্ত মাছ উৎপাদন করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ পোল্ডারে এবং বিশেষ করে বরিশাল অঞ্চলে এ রকম বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ পলী গড়ে তোলা সম্ভব। এ অঞ্চলে এ ধরনের চাষের একটি বাড়তি সুবিধা হলো উপকূলীয় নদ-নদীর পানি সব সময়, সব স্থানে নোনা থাকে না। জোয়ার-ভাটা আছে বলে পানির তেমন অভাব হয় না। প্রয়োজনে পানি অদল বদল করা যায়। তাই, মাছের উৎপাদন খুবই সন্তোষজনক। বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন বরোপিট, ডোবা, পুকুর, দীঘি, মরা খাল, মরা নদীতে এবং প্রবাহমান নদীতে খাঁচায় এসব মাছের চাষ চলে। জোয়ারভাটা প্রবণ গোটা উপকূল জুড়ে সুবিধাজনক জায়গায় এধরণের বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠলে সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান, দারিদ্র পীড়িত উপকূলীয় গ্রামীন অর্থনীতিতে বইবে দিন বদলের সুবাতাস।

ভেটকী, পার্শে, নোনা টেংরার চাষঃ

উপকুল হলো সাগর ও নদীর মিলন মেলা, পাওয়া যায় পার্শে, ভেটকী, ভাঙ্গন, ভোলা। এ অঞ্চলের বড় সুস্বাদু ও মূল্যবান মাছ। একদা এ অঞ্চলের নদনদী ও পাবনভূমিতে এবং সনাতনী বাগদা চিংড়ি ঘেরে সাথী ফসল হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। উপকূলীয় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব মাছ আর আগের মত পাওয়া যায় না। তবে এ অঞ্চলে এসব মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভানা রয়েছে। পার্শে, ভাঙ্গন, নোনা টেংরা, চিত্রা, বাগদা চিংড়ির সাথে সাথী ফসল হিসাবে চাষ শুরু হয়েছে। খরশুলা গলদা চিংড়ির ঘেরে অন্যতম প্রধান সাথী ফসল। চিংড়ি খামারে পানির পরিবেশ ভাল রাখা ও চাষের ঝুঁকি কমাতে সাথী ফসল হিসাবে এসব মাছের চাষ বেশ গুরুত্বপুর্ণ। মিশ্র অথবা একক পদ্ধতিতে এ সকল মাছের চাষ করা যায়। হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন সম্ভব হলে উপকূলীয় অঞ্চলে এসব মাছের চাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহারঃ

নানা রকম মাছ ও জলজ জীব চাষের অপার সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও উপকুলীয় জমি ও জলকে আমরা এখনও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারছি না । প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষ সম্প্রসারণে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে । পরিকল্পিত পুকুর, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, উন্নত পোনা, মানসম্পন্ন খাবার, লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষ চাষের এসব সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন ও বিরুপ আচরণ মাছ চাষকে আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে । আগামী দিনের জন্য লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি কি হবে তা নিয়ে ভাববার সময় এখনই । এলক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদের কোন বিকল্প নেই । প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ, এবং উপকূলীয় অঞ্চলের অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে এসব বিষয় উপকূলীয় চাষীদের নিকট সহজলভ্য করতে হবে । তাছাড়া জল ও জমির ওপর উপকূলীয় নানা মানুষ, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নানা রকম স্বার্থ নানাভাবে জড়িত । তাই, বিচ্ছিন্ন কোন প্রয়াস ও উদ্যোগ তেমন কোন কাজে আসবে না । উপকূলীয় জনগণের স্থায়ীত্বশীল জীবন জীকায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । তবেই উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষের বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে । উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষের যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তা যদি আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি তবেই উপকুলীয় জীবন জীবিকায় ফিরে আসবে স্বস্তি ও স্বচ্ছলতা ।

শাবানা ফার্ম প্রডাক্টস

কর্মসংস্থানে সফল নারী

ফারহীন রিশতা বিনতে বেনজীর, পরিচালক, শাবানা ফার্ম প্রডাক্টস

শাবানা ফার্ম প্রোডাক্টস বৃহত্তর এগ্রো সেক্টর একটি সমন্বিত খামার । গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানাধীন বৈরাগী টোল, সাহাপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শাবানা ফাম প্রোডাক্টস ২০১২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে । এখানে পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য, ডেইরি, পোল্ট্রি, ফুল, ফল, ঔষধী গাছ ও নানা প্রকার সবজির চাষাবাদ করা হয় যা প্রায় ২০০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানে গবেষণা মূলক বিভিন্ন চাষাবাদও করা হয়ে থাকে ।

এখানে ৩০০ শত লোকের কর্মসংস্থান আছে, বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে (বটমক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে) মাছ চাষ হয় এখানে , চাষকৃত মাছের প্রজাতিগুলোর মধ্যে শিং, পাবদা, গুলশা, কার্প এবং শোল অন্যতম । এটি একটি সেমি অর্গানিক চাষ পদ্ধতি যেখানে প্রাকৃতিক ভেষজ নিম এবং প্রোবায়োটিক ব্যাবহার করা হয় যা মাছের জন্য একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে । বর্তমানে আধুনিক এই মাছ চাষ পদ্ধতিটি অভিজ্ঞ ফিশারিজ কনসালটেনট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । অর্গানিক পদ্ধতিতে মাছ, সবজি ও পোল্ট্রি উৎপাদন হয় এবং কোন ক্ষতিকর অ্যানটিবায়োটিক ও গ্রোথ প্রোমোটর ব্যবহার করা হয় না সুতরাং এখানকার উৎপাদিত পণ্য শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত, বৎসরে এখান থেকে প্রায় ১২০/১৫০ টন মাছ, ২০/২৫ টন সবজি, ১০০/১২০ মাংস উৎপাদন হয় ।

আমাদের নিম্নোক্ত লক্ষ্য এই ফার্মের মাধ্যমে আমাদের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা যা করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

- স্বাস্থ্য সম্মত বিশ্বমানের নিরাপদ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করণ যা আমাদের ভোক্তাদের অধিকার ।
- আমাদের দৃষ্টি নিরাপদ বিশ্বমানের পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়া এবং বিতরণ যা করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।
- সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর এগ্রো সেক্টরের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।
- সর্বোপরি একটি গতিশীল এবং চ্যালেঞ্জিং বিশ্ব বাজারের সাথে একটি সুস্থ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ।

আমরা আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা আমাদের যোগাযোগের প্রতিটি ব্যক্তিকে উচ্চতর মানের পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত । দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শাবানা ফার্ম প্রডাক্টস অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং শাবানা ফার্ম প্রোডাক্ট এর উত্তরোত্তর সাফল্য বৃদ্ধির জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি, ধন্যবাদ ।

সোনার বাংলা হ্যাচারি

ডাঃ আবুল কাশেম মোহাম্মদ গোলাম করিম

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ছে না । অতি আহরণ, জলাশয় সংকোচনের কারণে মাছ উৎপাদনে ভাটা পড়ছে । এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য দেশে মাছ উৎপাদনের যে চেষ্টা চলছে সোনার বাংলা হ্যাচারী এন্ড ফার্মস লিঃ তার অংশীদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । ২০১২ সালে World Fish ও B.F.R.ও এর মাধ্যমে দেশের ময়মনসিংহ, যশোর, নড়াইল, লক্ষীপুর, বাগেরহাট ও বরগুনায় (সোনার বাংলা হ্যাচারী) তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস স্থাপন করা হয় । World Fish কনসাল্টেন্টের মাধ্যমে দীর্ঘ পাঁচ বছর এখানে রোটেশনাল ব্রিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উন্নত জাতের তেলাপিয়ার উৎপাদন ও বিতরণের কাজ চলতে থাকে । এই পদ্ধতিকে অনুসরন করে আমরা বর্তমানে তেলাপিয়ার ১৯তম জেনারেশনে পৌছেছি । দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল বিভাগে সোনার বাংলা হ্যাচারী তেলাপিয়া উৎপাদন ও বাজারজাতকরনে একমাত্র বড় প্রতিষ্ঠান । আমরা এ অঞ্চলে নদীতে খাচায় তেলাপিয়া মাছ চাষের একমাত্র সফল উদ্যোক্তা । বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় সরকারি, বেসরকারি অর্থায়নে খাচার প্রযুক্তি স্থাপন ও পোনা সরবরাহ করে থাকি । দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ মাছ আহরণের ব্যাপারে নদী-সাগরের উপরই নির্ভরশীল ছিল । বলা চলে বদ্ধ জলাশয়ে বানিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনে অভ্যস্ত ছিল না । যার ফলে নদী-সাগরে মাছ আহরণের বে-মৌসুমে গ্রাম অঞ্চলের বাজারগুলোতে তেমন মাছ পাওয়া যেত না । যদিও বাহির থেকে আসা অল্প-সল্প মাছের দেখা মিলত । কিন্তু মাছের বাজার দর থাকত সব সময়ই অনেক বেশী । এ অবস্থায় সোনার বাংলা হ্যাচারী মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা উৎপাদন ও বাজারজাত করার পর দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী জলাশয়ের মালিকরা মাছ চাষে আকৃষ্ট হয় । নিজেদের এই ক্ষুদ্র ও মাঝারী জলাশয়ে বছরে ২-৩ বার মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ উৎপাদন করে নিজেদের আমিষের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত মাছ স্থানীয়ভাবে বাজারজাত শুরু করে । যার ফলে এ অঞ্চলে এই তেলাপিয়া মাছ যেখানে প্রতি কেজি ২০০-২২০ টাকায় কিনতে হতো তা এখন ১২০-১৪০ টাকায় মানুষ কিনে খেতে পারে । এখন গ্রামাঞ্চলে সারা বছর মাছ পাওয়া যায়, দামও সস্তা । সোনার বাংলা হ্যাচারী প্রতি বছর এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের কাছে ৪০-৫০ লাখ মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বাজারজাত করে থাকে । পোনা বাজারজাত করার পাশাপাশি চাষীদেরকে ভালভাবে মাছ চাষ পদ্ধতি ও বাজারজাত পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত, মৌখিক ও সরজমিনে গিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে । বরিশাল বিভাগে সরকারী বা দাতা সংস্থার মাধ্যমে গরীব জনগনের মাঝে মাছ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরনে যে তেলাপিয়ার পোনা বিতরন করা হয়, সেই পোনাগুলোও বেশিরভাগ সোনার বাংলা হ্যাচারীই সরবরাহ করে থাকে ।

সফলতার গল্প

মোঃ আব্দুস সালাম মিয়া

সময়টা ছিল ২০০৫ সাল, আমি মোঃ আব্দুস সালাম মিয়া। বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার হরিরামপুর গ্রামে। অল্প বয়সে বাবা মারা যায়, পাঁচ ভাই দুই বোন এবং আমার মা আট জনের সংসারের দায়িত্ব তখন আমার কাঁধে। কৃষি কাজ করে সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। এক বন্ধুর পরামর্শে কাছাকাছি একটা সমিতি থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পশে থাকা ৩০ শতক পুকুরে মাছ চাষ শুরু করি। শুরু হয় মাছ চাষ কিন্তু বেশি দূর এগুতে পারছিলাম না। প্রথম ও ২য় বছরে কেবল লোকসানই হয়, আমি প্রায় পথে বসে যাই। পরবর্তী ৩ বছর আর মাছ চাষ করা হয়নি। একদিন বাজারে এক খাবারের দোকানে বসেছিলাম, তখন পরিচয় হয় মোঃ হায়দার ভাইয়ের সাথে যিনি তখন কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড-এর একজন মৎস কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার সাথে কথা বলি এবং পরবর্তীতে তার পরামর্শ ও সহযোগীতা নিয়ে পুনরায় মাছ চাষ করার জন্য মনস্থির করি এবং পুনরায় মাছ চাষ শুরু করি। যাকে বলে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ। তখনি জানতে পরি খাদ্য রূপান্তর হার সম্পর্কে, যে ঠিক কতটুকু খাবার খাওয়ালে কতটুকু মাছের উৎপাদন সম্ভব এবং আমি হায়দার ভাই এর পরামর্শে সকল আধুনিক পদ্ধতি শিখতে থাকি। ১ম বছরেই আমি কিছু লাভের মুখ দেখি, ২য় ও ৩য় বছরে আমি আরো লাভবান হই এবং ৪র্থ বছরে আমার এলাকার কিছু পুকুর লিজ নিয়ে বড় আকারে মাছ চাষ শুরু করি। বর্তমানে আমার ৭০টি পুকুর রয়েছে এবং আমি আমার সকল পুকুরে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড কোম্পানির মাছের খাদ্য ব্যবহার করছি এবং অন্য খামারিদেরকেও এই খাবার ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। আমি পরপর ২ বছর কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের শ্রেষ্ঠ মৎস খামারী হিসেবে নির্বাচিত হই। এই মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে আমার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। বোনদের বিয়ে দিয়েছি, ভাইদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, বর্তমানে আলাহ পাকের রহমতে আমার আর অভাব নেই। আমার খামারে বর্তমানে ৫৩জন শ্রমিক কাজ করছে। সব কিছু সম্ভব হয়েছে আলাহ্ পাকের রহমত, হায়দার ভাই আর কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সহযোগিতায়। যুগ যুগ খামারিদের পাশে এভাবেই থাকুক কোয়ালিটি ফিডস। ধন্যবাদ কোয়ালিটি ফিডস।

গণমাধ্যমের চোখে মৎস্য চাষ

শামীমা সুলতানা

প্রযোজক ও ইনচার্জ, দীপ্ত কৃষি অনুষ্ঠান, দীপ্ত টেলিভিশন

আমরা নিজেদের বলতে ভালোবাসি আমরা‘মাছে ভাতে বাঙ্গালি’! নদী মাতৃক দেশ আমাদের। এখানকার পলি জমা উর্বর মাটি হওয়ায় আমাদের দেশের মানুষরা দানাদার শষ্যের সাথে খাদ্যাভাসে যুক্ত করে নিয়েছেন নদী-নালা খাল-বিল বা জলাশয়ে পাওয়া নানান ধরনের মাছ। কিন্তু ক্রমোবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মানুষ শুধুই প্রকৃতির ওপর নির্ভর না থেকে নিজেরাই গড়ে তুলছেন শষ্য বা মাছের খামার। বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অর্জনে যাদের ভুমিকা সব থেকে বেশি তারা হলেন এদেশের কৃষক, খামারি এবং মৎস চাষীরা। এই মানুষগুলোর পাশে থেকে যারা ভুমিকা রাখছেন তারা হলেন দেশের কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী এবং সরকারী, বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান। এদেশেরা কৃষক এখন খোরপোশ কৃষি থেকে বেড়িয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে এগোচ্ছে। কয়েক দশকে নিরবেই বিপব ঘটে গিয়েছে বাংলাদেশের কৃষি খাত। আর এই বিপবের নিরব গল্পগুলো তুলে ধরছি অনুঘটক হিসেবে আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মীরা আছি।

কৃষি এবং গণমাধ্যমের সাথে আমার পথ চলা শুরু ২০১৫ সাল থেকে। কখনও ভাবিনি এই পেশায় কাজ করবো। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের প্রতি এতটা দরদ অনুভব করবো তা আগে ভাবনাতে ছিলো না। আজ তারই ধারাবাহিকতায় ফোয়াব সম্মাননা’ ২০২২ আমাকে মনোনিত করায় গর্ব বোধ করছি। কারণ প্রথম বারের মতন কোন সংগঠন আমাকে সম্মানিত করার জন্য মনোনিত করেছেন। আরো ভেবে অবাক হয়েছি যে সরাসরি মৎসচাষীদের চোখে আমি নির্বাচিত হয়েছি!! এই সম্মাননা শুধু আমার একার নয় এটি আমাদের দীপ্তকৃষি পরিবারের সকলের। কারণ আমরা দীপ্তটিভির কৃষিটিম ৭টি বছর ধরে তুলে ধরার চেষ্টা করছি কৃষক, খামারী ও মৎস জীবিদের সংগ্রামী জীবনের গল্প। ছুটে গিয়েছি দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। নদী, পাহাড়, সমতল সবখানেই আমাদের পদচারণা ছিলো দৃপ্তপদভারে।

মৎস্য চাষীদের নিয়ে আমার ভাবনা বরাবরই ছিলো একটু ভিন্নরকম । প্রতি মাসেই যখন ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় কৃষির ওপর প্রতিবেদন করতে যেতে হয়, তখন কিছু মানুষদের কথা সবসময় মনের ভিতরে থেকে যায় আমার । তারা হলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জেলে পরিবার । নিজ চোখে দেখেছি, অনুভব করেছি এবং খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি সে সকল অসহায় মানুষদের অন্তরকথন । ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে টানা ৩ বছর বেশকিছু কাজ করেছিলো দীপ্তকৃষি টিম । অঞ্চল ভিত্তিতে মৎস্য চাষী এবং জেলেদের গল্প উঠে এসেছে দীপ্তকৃষির সে সকল অনুষ্ঠানে । এখনও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে ।

নদী এদেশের প্রাণ । নদীমাতৃক এদেশে শাখা-প্রশাখা সহ প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪ হাজার একশত ৪০০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে প্রবাহিত প্রবাহিত হচ্ছে । নদী কেন্দ্রিক মানুষদের জীবন ও জীবিকার বড় একটি অংশ হচ্ছে মৎস্যজীবী । দেশের সমুদ্রকে কেন্দ্র করে উপকূলবর্তী জেলার মৎস্যজীবী এবং নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত মৎস্যজীবীদের কাছে গিয়েছি শুনেছি তাদের মুখ থেকে তাদের জীবন সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন কথা । মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সময় জেলেদের পরতে হয় ডাকাতের কবলে অথবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভেতর প্রতিকূল পরিবেশে অনেক সময় প্রাণ হারান মৎস্যজীবী মানুষগুলো । কিন্তু তাদের নেই কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ।

অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় জলমহলগুলো মৎস্যজীবীদের কাছে ইজারা প্রদান করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে এগুলো চলে যায় সম্পদশালীদের কাছে ফলে প্রকৃত জেলেরা নানাভাবে বঞ্চিত হয় সম্মুখীন হন নানামুখী সংকটের ।

জেলেদের অনেকে আছেন যারা শুধুমাত্র মৌসুমে ইলিশ আহরণের উপর নির্ভরশীল । মা ইলিশ রক্ষার জন্য বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকে ইলিশ মাছ আহরণ-বিপণন ও পরিবহনে । এইসাময়িক অসুবিধা দূরীকরণে এ সময়ে জেলেদের সহযোগিতায় সরকার ভালো কিছু উদ্যোগ নিলেও দীপ্ত কৃষির ক্যামেরায় উঠে এসেছিল অন্য রকমের এক চিত্র । আমরা দীপ্ত কৃষি টিম যখন ইলিশ সংগ্রহকারী জেলেদের সাথে কথা বলেছিলাম তখন তাদের ভাষ্যমতে সরকার থেকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা সঠিক সময়ে কখনোই তা পায়নি । আবার অনেকে জেলে কার্ডও পায়নি । সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অনেক জেলে আবার কার্ড থাকলেও কার্ডের যে সুবিধা তা পাননি তারা ।

আমার মনে পরে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ফেরিঘাট এলাকাতে বেশকিছু মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠান করেছিলাম । সেখানে উপস্থিত ছিলো সেখানকার প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা এবং সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু কর্মকর্তাগণ । তাদের সকলের উপস্থিতিতে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হয় । তাদের মতে যে সময় ইলিশ মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকে সেসময় বড় মাছ ধরার একটি মৌসুম থাকে যেমন রুই, কাতল, বোয়াল । তাদের ভাষ্যমতে যে জাল দিয়ে তারা মাছ ধরবেন সে জালে ইলিশ ধরা পড়ে না তা সত্ত্বেও নদীতে নামতে দেয়া হয়না মাছ না ধরার জন্য । এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই সকল মৎস্যজীবীরা । মহাজনী সুদ, ঋণগ্রস্ততা সবমিলিয়ে তারা খুব কষ্টের সময় পার করে কারণ সে সময় তারা নদীতে নামতে পারে না আবার সেই সময়ই যে সময় তার নদীতে নামতে পারছেন না ঠিক সে সময় উপার্জনের একটি ভাল পথ তাদের বন্ধ হয়ে যায়

জামালপুরের মৎস্যজীবীরা বলেছিলেন একটু ভিন্ন রকমের কথা । সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা তাদের সমস্যা নিরসন করতে চান পাশাপাশি সরকার থেকে মৎস্যজীবীদের জন্য বীমার সুযোগ-সুবিধা করে দিলে তারা আরো বেশি উপকৃত হতেন । যা এ সক্রোন্ত একটি হোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে দীপ্ত টিভিতে তুলে ধরেছিলাম ।

২০১৬ সালে আমরা গিয়েছিলাম ভোলার ইলিশা ঘাটে সেখানে জেলে কামাল মাঝির সাথে কথা বলতে বলতে তার ছোট্ট ট্রলারে করে নদীতে এগোতে থাকি । হঠাৎ দেখলাম চারপাশ অন্ধকার হয়ে ঝড় শুরু হয়েছে, ঠিক সে সময়ই আমরা আসলে মেঘনা নদীতে । কামাল মাঝির সাক্ষাৎকার নিতে নিতে কখন যে মাঝ নদীতে চলে এসেছি তা গল্পে গল্পে টেরই পাইনি । প্রচ- ঝড়ের কবলে পড়ি সেদিন । ক্যামেরা গুটিয়ে ত্রিপল এর মধ্যে সবাই মাথা ঢুকিয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না । অন্ধকার ঘরের মধ্যে মনে হচ্ছিল ট্রলারটি অনেক উপরে উঠছিল এবং নিচে নামছিল । দীপ্ত কৃষি টিমের ৬ সদস্যসহ সেদিন ট্রলারে ছিল জেলে কামাল ভাই । সেই মুহূর্তে আমি অনুভূতিহীন ছিলাম, শুধু চারপাশটা দেখছিলাম । প্রায় এক ঘণ্টা সময় ছিল আমাদের সেই শ্বাসরুদ্ধকর ঝড়ের পথ । মেঘনার অমন রূপ আগে কখনো দেখা হয়নি আমার । তীরে ফেরার পর যখন কামাল ভাইয়ের সাথে তার বাড়িতে যাই, তখন ভাবিকে বললাম আজ তো আমরা ঝড়ের কবলে পড়েছি, এধরনের কি প্রায়ই কামাল ভাইকে পড়তে হয়? আর তখন তার সহধর্মিনী বললেন আমাগো পথ চাইয়া থাকতে হয়...আপদ-বিপদতো থাকবোই । তাই বলে তার নদীতে যাওয়া বন্ধ থাকবো না ।

রাতে যখন গেস্ট হাউজে ফিরে সারা দিনের কথা ভেবে আতঙ্ক অনুভব করছিলাম । এই মানুষগুলো দুবেলা ডাল ভাত খাওয়ার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই দিনের পর দিন সংগ্রামী জীবন যাপন করে যাচ্ছেন । অথচ তাদের জন্য কি আমাদের করণীয় কিছুই নেই?? সে প্রশ্ন হয়তো থেকেই যাবে ।

আমার কাজের ধারাবাহিকতায় আমি ছুটে গিয়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাণিজ্যিক মৎস্য খামারিদের কাছে । এখন মাছ চাষের ক্ষেত্রে অনেক আধুনিক উপায়ও মাছ চাষ করছেন মৎস্যজীবীরা । সাথে যুক্ত হয়েছে কাঁকড়া-কুচিয়া রপ্তানিমুখী বিভিন্ন খামার ।

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমাদের এই দেশ একটা সময় উন্নত দেশ হবে । কিন্তু যে মানুষদের জন্য আজ এগিয়ে যাচ্ছে দেশ সেই মানুষগুলোর সুখ দুঃখের কথাগুলো ভাবা খুব জরুরী । তাদের সাফল্য, তাদের সংকট এবং সংকটগুলো থেকে বেরিয়ে কী করে নিজেদের ভালো অবস্থানে নেবেন এবং দেশের প্রতি অবদান রাখবে সেই বিষয়গুলো হয়তো গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে তুলে ধরা এবং সেই মানুষগুলোকে উৎসাহিত করার গুরুদায়িত্ব আসলে আমাদের । তাই মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি ।

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি

মো: আবুল কালাম পাটোয়ারী ও পলাশ কুমার ঘোষ

(১) ভূমিকা

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান । বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরন, কমপায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপনন ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্য এসোসিয়েশন সমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) মডেলের আলোকে এই খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে । বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ মুলতঃ কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ণ ও যোগান সংশিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে ।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বানিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ কার্যকর করা হয়েছে । উক্ত রপ্তানি নীতিতে, সক্রিয় কাউন্সিল সমূহের কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোরালো ভাবে উলেখ রয়েছে । খাত ভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমে ঃ (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (গ) মেডিসিনাল পান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিশারি প্রোডাক্টস, (চ) এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং (ছ) পাষ্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতিমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাত ভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানি-মুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে । বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ-আভ্যন্তরীন গবেষনা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। উলেখ্য যে, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (চচচ) মডেলের একটি সফল নিদর্শন ।

(২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট

রপ্তানি বহুমুখীকরনের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানিকে প্রবৃদ্ধি আনবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয় । দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগীতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয় । সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুনগত মান ও মূল্যমান এর একটি সু-সমম্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের কাতারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামুলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে । আমাদের দেশের তৈরী পোষাক শিল্পব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে । সে প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে দেশীয় রপ্তানিখাতের সলপ্রসারনে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য স্থিরপূর্বক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমান রাখা সম্ভব । উপরোলিখিত প্রেক্ষাপটে “Bangladesh Export Diversification Project (BDXDP)” শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের সফলতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরিখে ২০০২ সালে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে । এক্ষেত্রে পিছেয়ে-পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন পাটফর্ম তৈরী করাই ছিল বিপিসি'র মূল উদ্দেশ্য ।

(৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যঃ

(ক) আমদানি ও রপ্তানি নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাউন্সিল নিজে এবং এর সহযোগী সেক্টর কাউন্সিল/ সংগঠনসমূহের মাধ্যমে বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা বা স্টাডি, পর্যবেক্ষণ ও বিশেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষন (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা । রপ্তানি বহুমুখীকরনের (রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণ) মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণ পূর্বক একক পণ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে জাতীয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আনায়ন;

(খ) রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়নের (Domestic Business Development) সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করা এবং উৎপাদন ও বাজারজাত করণের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখা;

(গ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য সেবা/পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সেবা ও পণ্যের সরবরাহ/যোগান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসল্মত পণ্য উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Compliance Factors) অনুসরণ পূর্বক মোড়কজাতকরণ, উচ্চমূল্যের (Value added) পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৪) বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলগুলি পরিচালনা কমিটিঃ

(৪.১) কো-অর্ডিনেশন কমিটিঃ

বিপিসি ও ৭টি সেক্টর কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে । বর্তমানে উক্ত কমিটি'র সদস্য সংখ্যা মোট ৪২ জন । পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিপিসির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো বিপিসির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিণিধিগণ ও সেক্টর সংশিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য । এই কমিটি সরকারি নীতিমালার আলোকে কর্ম পরিকল্পণা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক ব্যয়সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে এবং কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে । এভাবে কাউন্সিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কাজ করে আসছে এবং কাউন্সিল কো-অর্ডিনেটর চেয়ারম্যান এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কর্ম পরিচালনা করছে ।

(৪.২) কার্যনির্বাহী কমিটি:

প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের ১টি করে কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো উক্ত সেক্টর কাউন্সিলসমূহের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সেক্টর সংশিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। কার্যনির্বাহী কমিটিতে সেক্টর কাউন্সিলের কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্ধকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক ব্যয় সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(৫) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি:

রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এ সকল খাতভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পরিবেশ দূষন ও কমপায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেলস কীট প্রণয়ন, ডকুমেন্টরী তৈরী, উন্নয়ন নীতি বিশেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান, পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

- এছাড়াও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল: (ক) বাজার সংশিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলেচনা ও মতবিনিময় ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহের (যেমনঃ পণ্য প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য বিতরনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে।

(৬) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পণ্য ভিত্তিক ৭ টি কাউন্সিলের বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

নিম্নে একটি ছকে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সাতটি পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমসমূহের বিবরণ	কার্যক্রম সংখ্যা
১.	গবেষণা/প্রকাশনা	১৩
২.	কর্মশালা/সেমিনার	৪৬
৩.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অফ লাইন)	১৩২
৪.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অন লাইন)	৯০
৫.	প্রমোশনাল কার্যক্রম	০৬
৬.	সচেতনামূলক কার্যক্রম	০৬
৭.	প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন	০৩
	সর্বমোট	২৯৬

(৭) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহঃ

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশী দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন পড়সঢ়ড়হবহঃ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথা: ১. Export Competitiveness for Jobs Project (Funded by World Bank Group for Leather, light engineering and plastic sector), ২."ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩. Export Launchpad Bangladesh project। ইতোপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ component বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে:

1) Bangladesh Leather Service Centre Project funded by ITC-Geneva for Leather Sector

2) The base line survey for leather sector SMEs in Footwear & leathergoods funded by Abdul Monem Foundation

3) Capacity building of BPC funded by KATALYST

4) Design & Development of leather products Project funded by GIZ for Leather Sector

5) Asia Trust Fund Project funded by EU for Leather Sector

6) Assistance for capacity building Project for light engineering sector funded by SEDF

7) Awareness Build up programme for leather sector funded by PRICE Project, USAID

(৯) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এফপিবিপিসি) ঃ

বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এ বিভিন্ন সেক্টর/ খাতভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটানোসহ এই সকল সুনিদিষ্ট শিল্পের বিভিন্ন ধরনের সমস্য চিহ্নিতকরন ও এর সমাধানকল্পে সেক্টর/ খাতভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের উপর জোর দেয় এবং ইহা দ্রত গঠনরে ব্যাপারে সুপারিশ করে । অধিকন্তু মৎস্য পণ্যশিল্প সংশিষ্ঠ উদ্যোক্তা ও এর অংশীজনেরা এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য একটি সেক্টর সংশিষ্ঠ কাউন্সিল গঠনের দাবী জানায় । এজন্যই এই এটি রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । সেই আলোকে এরূপ একটি সেক্টর সংশিষ্ঠ কাউন্সিল গঠনের জন্য Memorandum of Association (MOA) ও Article of Association (AOA) তৈরী এবং উক্ত কাউন্সিলের কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তৎকালীন যুগ্ম সচিব (রপ্তানী) কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয় । এবং পরিশেষে উক্ত কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১২/০৩/২০০৮ তারিখে ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠিত হয় ।

(৯.১) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের বর্তমান সদস্য এসোসিয়েশন সমূহঃ

(ক) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টারিস এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
(খ) বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ)
(গ) বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এ্যালাইন্স (বিএএ)
(ঘ) শ্রিম্প হ্যাচারী এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব)
(ঙ) ফিস ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)
(চ) বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন (বিএমএফএ)
(ছ) বাংলাদেশ নন প্যাকার্স ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টারিস এসোসিয়েশন (বিএনএফএফইএ)
(জ) ন্যাশনাল শ্রিম্প ফারমার্স এসোসিয়েশন (এনএসএফএ)
(ঝ) বাংলাদেশ সল্টেড এন্ড ডিহাইড্রেট মেরিন ফুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন
(ঞ) বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন

(৯.২) এফপিবিপিসি'র নির্বাহী কমিটির বর্তমান সদস্যবৃন্দঃ

১. চেয়ারম্যান, সিনিয়ন সচিব / সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২. ১ম ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)
৩. ২য় ভাইস চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
৪. সদস্য, অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৫. সদস্য, অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
  ১. সদস্য, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

২. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
৩. সদস্য, মহাপরিচালক, ইস্ট এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪. সদস্য, মহাপরিচালক (পণ্য উন্নয়ন বিভাগ), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)
৫. সদস্য, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ)
৬. সদস্য, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
৭. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অ্যাকোয়্যাকালচার অ্যালাইয়্যান্স (বিএএ)
৮. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, প্রিম্প হ্যাচারী এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব)
৯. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, ফিস ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)
১০. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন (বিএমএফএ)
১১. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নন-প্যাকারস্ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএনএফএফইএ)
১২. সদস্য, উপ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়
১৩. সদস্য, উপ সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৪. সদস্য, মহাব্যবস্থাপক (এগ্রিকালচার ক্রেডিট বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক
১৫. সদস্য, পরিচালক, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)
১৬. সদস্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট (খুলনা অঞ্চল), বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
১৭. সদস্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট (চট্টগ্রাম অঞ্চল), বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
১৮. সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)
১৯. সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ)
২০. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল শ্রিম্প ফারমার্স এসোসিয়েশন (এনএসএফএ)
২১. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সল্টেড এন্ড ডিহাইড্রেট মেরিন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন
২২. সদস্য, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন
২৩. সদস্য সচিব, কো-অর্ডিনেটর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল।
২৪. সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ)
২৫. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল শ্রিম্প ফারমার্স এসোসিয়েশন (এনএসএফএ)
২৬. সদস্য, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সল্টেড এন্ড ডিহাইড্রেট মেরিন ফুডস্ এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন
২৭. সদস্য, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন
২৮. সদস্য সচিব, কো-অর্ডিনেটর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল।

(৯.৩) এফপিবিপিসি'র কর্মপরিধিঃ

রপ্তানি ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এই খাতভিত্তিক কাউন্সিল নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেঃ ১। পরিবেশ দূষণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ; ২। সেলস কীট প্রণয়ন; ৩। ডকুমেন্টরী তৈরী; ৪। উন্নয়ন নীতি বিশেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান; ৫। পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ; ৬। দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; ৭। পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনাসহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; ৮। বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন; ৯। নারী উদ্যোগতাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন; ১০। প্রচলিত ব্যবসাকে ই-বাণিজ্যে পরিনত করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং ১১। উন্নয়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ট্রেড ডেলিগেশন প্রেরণ ও গ্রহনে সহায়তা প্রদানসহ যুগোপযোগী বিষয়সমূহে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী দাতা, সংস্থা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এফপি-বিপিসি কর্তৃক সফলভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং সম্পাদিত হচ্ছে।

- এছাড়াও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলঃ (ক) বাজার সংশিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে। এবিষয়ে বিগত সময়ে উলেখ্যযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) নাইট্রোফুরান সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে যখন আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ উন্নত দেশগুলোতে ২০০৫ সাল হতে চিংড়ী রপ্তানিতে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিপিসি আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আইনি বাধাসমূহ ও কারিগরি সমাধানের বিষয়ে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে অংশগ্রহণ করে বিষয়টি নিস্পত্তি করেন।

২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল রপ্তানি বাজারে ক্রেতার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুণগত মানসলপন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশে ব্যাপকভাবে Contract Farming, Cluster Farming, E-Traceability, Good Agricultural Practices (GAP). Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Modern Technology প্রভৃতি যুগোপযোগী বিষয়ে উলেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় বাজার ও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

- ◆ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশী দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে।

(৯.৪) চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের চলমান কর্মসূচীসমূহঃ

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৫টি বিভিন্ন কার্যক্রম/ কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে গবেষনানির্ভর প্রদর্শনী প্রকল্প-০৩টি, প্রকাশনা-০২টি, কর্মশালা/সেমিনার-১২টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন- ২৫টি, সচেতনতা কার্যক্রম-০৩টি।

চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল প্রতি বছরের ন্যায় বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ যেমনঃ পরিবেশ দূষণ ও কমপায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টরী তৈরী, উন্নয়ন নীতি বিশেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান, পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনাসহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন, নারী উদ্যোগতাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি চলতি বছরে এফপিবিপিসি এর মিশন ও ভিশন এর উপর গুরুত্বারোপ করে রপ্তানি ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবেষনানির্ভর ০৩টি প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেঃ

1. Project Title: Experimental Cultivation of Seaweed on the Cox's Bazar Coast, Bangladesh

Location: Cox's Bazar Coast
Implementation period: Sept 2021 to June 2022
Expected outcomes:

- ✔ Suitable seaweed species will be known.
- ✔ Suitable sites will be identified.
- ✔ Seaweed growth regulating factors will be known.
- ✔ Nutritional and pollutants level of seaweed will be determined.
- ✔ Cost-benefit status of seaweed culture will be identified.

Implementing Association: Bangladesh Marine Fisheries Association (BMFA)

Expected outcomes:

- ✔ Identified investment opportunities for the stakeholders of aquaculture sector in Bangladesh;
- ✔ Trained shrimp/fish farmers on modern hatchery operations and production processes of seabass in the coastal region of Bangladesh;
- ✔ Prepared a brochure/training manual on the modern approaches of seabass farming;

Implementing Association: Bangladesh Shrimp & Fish Foundation (BSFF)

3. Project Title: Experimental culture of SPF Nauplii of Vannamei shrimp in SPF Hatchery in Bangladesh

Location of Activity: Khulna

Time/Implementation period: July, 2021 to June, 2023

Implementing Association: Bangladesh Frozen Foods Exporters Association (BFFEA)

(৯.৫) মৎস্য সেক্টর তথা জাতীয় জীবনে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের বিগত বছরে উলেখযোগ্য অবদানসমূহঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের কম-বেশি শতকরা দুই ভাগ এ খাতের অবদান। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এখাতের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ন। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঙ্খিত প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা ও সেক্টর সংশিষ্ঠ স্টেকহোল্ডারদের নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে বিগত ১০ বছরে এখাতে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৬.৩১ শতাংশ এবং এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্যভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর। মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সারাবিশ্বে আলোচিত ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরো দৃঢ় ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি মৎস্যসলপদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সহয়োগীতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সেক্টর সংশিষ্ঠ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগী নীতি-কৌশল গ্রহণের কারনে দেশের মৎস্য সেক্টরের কাঠামোগত পরিবর্তনসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে চলেছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে মৎস্য সেক্টরে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের উলেখযোগ্য অবদান দেওয়া হলঃ

- ✔ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করতে বিগত বিভিন্ন সময়ে EU-FVO মিশন / অডিট কর্তৃক সুপারিশের আলোকে HACCP, GAqP, GMP, Codex Allimentarius Program, E-traceability, Labor law & Labor rules, Occupational Safety and Health Hazard, Encrease of production of Black tiger and Fresh water (Galda), TRACES, EMS in shrimp production, Techniques how to produce vannamei shrimp প্রভৃতি কমপায়েন্স বিষয়ক সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার কর্মশালা বাস্তবায়ন করেছে। বিগত ১০ বছরে এফপিবিপিসি কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৩০০ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ১৫,০০০ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে পরোক্ষভাবে দেশের প্রতান্ত অঞ্চলের চাষীপর্যায় থেকে শুরু করে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা পর্যন্ত মানসলপন্ন ও নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা সাধিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক পরিবর্তন তথা মৎস্যচাষীদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ভোক্তাদের কাছে মৎস্যপণের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

- ✔ "Cluster approach to increase BT production in a compliant manner with possibilities for scaling up and contribution to increase in the exports of Bangladesh Shrimps" -শীর্ষক গবেষণানির্ভর ১০টি প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ সুফল আমাদের উৎপাদন পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। যার কারনে হিমায়িত মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য বিবেচিত প্রধান কাঁচামাল চিংড়ির অপ্রতুলতার কারণে রপ্তানি আয় কাঙ্খিত মাত্রায় হয় না। অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হিমায়িত মৎস্য পণ্যের প্রক্রিয়াজাত কারখানার অর্ধেকেই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এজন্য বিগত কয়েকবছর ধরে দেশে সনাতন পদ্ধতি থেকে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি উৎপাদন করার প্রায়াশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি চাষ করার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে চিংড়ির উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২-৩ গুন বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যা চিংড়ি রপ্তানির জন্য বিবেচিত প্রধান কাঁচামাল এর সংকট অনেকাংশে দূর করবে এবং সর্বোপরি আমাদের রপ্তানি আয় তথা জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক পরিবর্তনে অনেক সুফল বয়ে আনবে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী প্রকল্প যেমনঃ আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি উৎপাদন, ক্লাষ্টার ভিত্তিতে মৎস্য চাষ, মনো-সেক্স বাগদা চিংড়ি চাষ প্রভৃতি আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ বিষয়ক প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চিংড়ির উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে তরান্বিত করা গেছে। এই সকল কর্মসূচী বর্তমানেও চলমান রয়েছে। আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বাস্তবায়িত প্রদর্শনী প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক সুফলভোগী সৃষ্টি হয়েছে, যারা জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

শুধুমাত্র গ্রামীণ যুব-মহিলাদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরে এফপিবিপিসি কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ৫০০ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে কর্মমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করা সর্বোপরি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। ইতোমধ্যে দক্ষিনাঞ্চলের চিংড়ি সেক্টরের চারণভূমি খ্যাত খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় অনগ্রসর নারী সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এরূপ কর্মসূচীসমূহ যথেষ্ট অবদান রেখেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

(৯.৬) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সদস্য এসোসিয়েশসমূহের সহায়তায় এফপিবিপিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহঃ

(৯.৭) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও এর সহযোগী এসোসিয়েশনের সহযোগীতায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহঃ

এছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ Handbook প্রকাশিত হয়েছে!

১) চিংড়ির মহামারি ও রোগ প্রতিরোধ (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএফএফইএ);
২) মূল্য সংযোজিত চিংড়ি ও কাঁকড়া (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএএ);
৩) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি ও মাছ বরফজাতকরন (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএএ);
৪) হিমায়িত চিংড়ি ও মাছের নিরাপদ পরিবহন (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএএ);
৫) মাছ ও চিংড়ির দ্রত হিমায়িতকরন (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএএ);
৬) মৎস্যে মাছি নিয়ন্ত্রণ (সহযোগী এসোসিয়েশনঃ বিএএ)।

পরিশেষে, বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম পর্যায়ের দেশে উন্নীত, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়করন, বৈদেশিক মুদ্র অর্জন এবং দেশের মানুষের আমিষের চাহিদাপূরণসহ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে আর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং এর সংশিষ্ট সদস্য এসোসিয়েশনসমূহ মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সর্দার এগ্রো - একজন সফল পাবদা চাষী

মোঃ খায়রুল কবির চঞ্চল
ব্যবস্থাপনা পরিচলক, সর্দার এগ্রো

সর্দার এগ্রো, এগ্রো সেক্টরে একটি সমন্বিত খামার, যাহা যশোর জেলার সদর থানাধীন ৪ নং নওয়াপাড়া ইউনিয়নে তালবাড়ীয়া গ্রামে অবস্থিত । সর্দার এগ্রো ২০১৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে এখানে পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মৎস, ডেইরি, বায়োগ্যাস ও নানা প্রকার সবজির চাষাবাদ করা হয়, যা প্রায় ৫০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানে গবেষনা মূলক বিভিন্ন চাষাবাদও করা হয়ে থাকে ।

এখানে ৪০ জন লোকের কর্মসংস্থান আছে, বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে (বটম ক্লিন রেসওয়ে পদ্ধতিতে) মাছ চাষ করা হয় এখানে, চাষকৃত মাছের প্রজাতিগুলোর মধ্যে পাবদা এবং কার্প জাতীয় মাছ অন্যতম । এটি একটি সেমি অর্গানিক চাষ পদ্ধতি যেখানে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হয় যা মাছের জন্য একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে । বর্তমানে আধুনিক এই মাছ চাষ পদ্ধতিটি অভিজ্ঞ ফিশারিজ কনসালটেন্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । এই পদ্ধতিতে যে মাছ ও সবজি উৎপাদন হয় সেখানে কোন ক্ষতিকর অ্যানটিবায়োটিক ও গ্রোথ প্রোমোটর ব্যবহার করা হয় না সুতরাং এখানকার উৎপাদিত পণ্য শতভাগ স্বাস্থ্য সম্মত । বৎসরে এখান থেকে প্রায় ২৪ টন মাছ, ৫ টন সবজি, ৫০ টন মাংস, ১,০৮,০০০ লিটার দুধ উৎপাদন হয় ।

আমাদের নিম্নোক্ত লক্ষ্য এই ফার্মের মাধ্যমে আমাদের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা যা করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ-

- ✔ স্বাস্থ্য সম্মত বিশ্বমানের নিরাপদ পন্য উৎপাদন নিশ্চিত করণ যা আমাদের ভোক্তাদের অধিকার ।
- ✔ আমাদের দৃষ্টি নিরাপদ বিশ্বমানের পন্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়া এবং বিতরণ করা ।
- ✔ সংশিষ্ট বৃহত্তর এগ্রো সেক্টরের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।
- ✔ সর্বোপরি একটি গতিশীল এবং চ্যালেঞ্জিং বিশ্ব বাজারের সাথে একটি সুস্থ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ।

আমরা আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা আমাদের যোগাযোগের প্রতিটি ব্যক্তিকে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সর্দার এগ্রো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং সর্দার এগ্রো, এর উত্তরোত্তর সাফল্য বৃদ্ধির জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি,

সর্দার এগ্রো

আয়-ব্যয় হিসাব ২০২০-২০২১

পুকুরের আয়তন	:	৩৫ শতাংশ
চাষ পদ্ধতি	:	Bottom Clean Raceway
চাষের প্রজাতি	:	পাবদা , কার্প জাতীয় মাছ
পাবদা মজুদ ঘনত্ব	:	৬০০০ টি / শতাংশ
কার্প জাতীয় মাছের ঘনত্ব	:	১০০০ টি
প্রাপ্ত মাছের সংখ্যা	:	১২ টন
উৎপাদিত পাবদা মাছের পরিমাণ	:	১১ টন
উৎপাদিত কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ	:	১ টন
মোট বিক্রিত পাবদা মাছ	:	১৭,০০,০০০/-
মোট বিক্রিত কার্প জাতীয় মাছ	:	২,৫০,০০০/-
সর্বমোট বিক্রয়	:	১৯,৫০,০০০/-

উৎপাদন খরচ

বিবরণ		টাকার পরিমাণ
খাদ্য খরচ (১১,০০০ কেজি X ৭০ টাকা)	:	৭,৭০,০০০/-
ঔষধ ও প্রোবায়োটিক বাবদ খরচ	:	১,৫০,০০০/-
বিদ্যুৎ বিল (৬ মাস)	:	১,২০,০০০/-
কর্মচারী বেতন	:	২,৫০,০০০/-
মাছ বিক্রয় খরচ	:	১০,০০০/-
পাবদা পোনা ক্রয় খরচ	:	১,৬০,০০০/-
কার্প জাতীয় মাছের পোনা ক্রয় খরচ		২০,০০০/-
সর্বমোট উৎপাদন খরচ		১৪,৮০,০০০/-

৩৫ শতাংশে Bottom Clean Raceway পদ্ধতিতে ৬ মাসে ১১ টন পাবদা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

নিট লাভ = ১৯,৫০,০০০-১৪,৮০,০০০ টাকা
= ৪,৭০,০০০ টাকা

Your Trading Solution

KAAS Trade

Product List

- Yucca Aide 35 (Yucca Schidigera Liquid Extract) (Origin-Mexico)
- Sodium Percarbonate (Tablet & Granular) (Origin-China)
- Zeolite Granular & Powder (Origin-Indonesia)
- Vitamin-C (Origin-China)
- Sodium Bicarbonate (Origin-China, Singapore)
- Halquinol 12.5% (Origin-India)
- ARIAKE 3 - Probiotics (Origin-Japan)
- One Time Breedmax (Fish Hormone, Origin-China)
- Zeolite with Probiotics, Yucca (Origin-India)
- 3A Emulsifier(Origin-Austria)
- PowerLac- Growth Promoter (Origin-Japan)
- Fish Gel, Fish Premix, Enzyme (Origin India)

*** Your Ultimate Solution in Aqua & Livestok Business ***

Head Office:
80/22, Mymensingh Road, Nurjehan Tower (8th Floor)
2 Link Road Bangla Motor, Dhaka-1000, Bangladesh.
Ph: +88-02-223361435, +88-01966-610262
+88-01918-779376, +88-01728-453541
Email: kaastrade@gmail.com
Web: www.kaastrade.com

Corporate Office::
Suite 304 (3rd Floor), Navana Zohura Square
Bangla Motor, Dhaka - 1000.
Ph: +88-02-55168090, +88-01966-610262,
+88-01948-779376, +88-01728-453541
Email: kaastrade@gmail.com
Web: www.kaasexport.com

ACI
এর পাশে থাকুন
রূপালি
Get it on
বিপ্লব সফল করুন

আপনি কি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও পোনার পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চয়তা নিয়ে চিন্তিত ??

ওভোহোম লিকুইড/পাউডার

মাছের প্রজননে ওভোহোম হচ্ছে সাশ্রয়ী, সর্বাধুনিক ও যুগপোযোগী প্রযুক্তি

- পুরুষ ও স্ত্রী ব্রুড মাছকে সমসাময়িক ডোজ দেয়া যায়
- শুধুমাত্র একবার হরমোন ডোজ প্রয়োগ করতে হয়
- উৎপাদন খরচ কমে ও হরমোনের অপচয় রোধ হয়

লিকুয়াভিট এ্যাকুয়া

দ্রুত বর্ধিষ্ণু রেণু পোনার জন্য
ইমিউনোস্টিমুলেন্ট সমৃদ্ধ লিকুইড মাল্টিভিটামিন

- ভিটামিনের অভাবজনিত ত্রুটি প্রতিরোধ করে
- চিংড়ির খোলস বদলাতে (মোল্টিং) সহায়তা করে
- চিকিৎসার প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিকের সাথে ব্যবহার্য
- পরিবহন জনিত ধকল উপশম করে
- পোনার সঠিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

নিউট্রি এগ্

মাছের রেনু ও পোনার জন্য অর্গানিক ডিমের পাউডার

- সকল ধরনের পুষ্টি উপাদানের আদর্শ উৎস
- রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাছের পোনা ও রেণুর বেঁচে থাকার হার বাড়ায়
- অধিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে

এসিলিনা

ক্যারোটিনেড সমৃদ্ধ ১০০% প্রাকৃতিক স্পিরুলিনা মাছ, চিংড়ি, পোল্ট্রি এবং গবাদি প্রাণির উৎকৃষ্ট প্রোটিন সম্পূরক

- ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ হওয়ায় দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে
- রোগ প্রতিরোধে সর্বাধিক কার্যকর
- উচ্চ মানের প্রোটিন যা সরাসরি খাদ্যের সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার্য
- পোনা ও পরিপক্ক মাছ এবং চিংড়ি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার্য
- সর্বাধিক আত্তীকরণ হার সমৃদ্ধ প্রোটিন

রেনু গোল্ড ™

মাছের পোনা ও চিংড়ির জন্য আদর্শ নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট

- পোনা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে
- সর্বোত্তম FCR সুনিশ্চিত করবে
- সকল অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের যথাযথ সমন্বয় ফলে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে
- সর্বাধিক হজম ক্ষমতা সম্পন্ন
- সম্পূর্ণরূপে এন্টিবায়োটিক্ মুক্ত

ACI Animal Health

রূপালি
Get it on

ACI AQUACULTURE

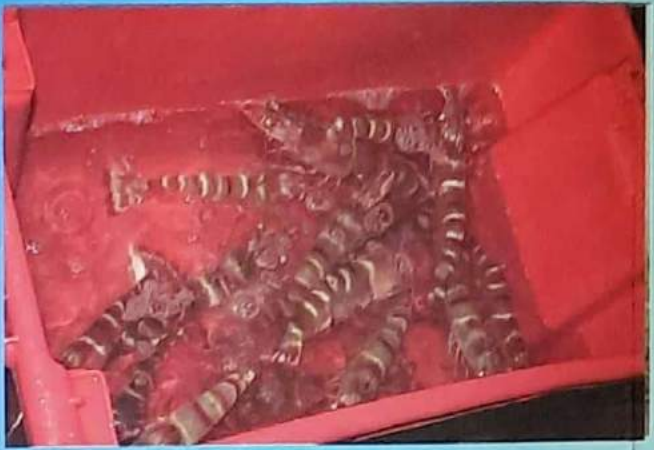

ACI Agribusiness

bpc
Business Promotion Council

QEL

DHAKA AERATOR